সংস্পর্শরহিত হইয়া সুখে ছিল, কিন্তু এক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়া মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে ও বায়ু প্রভৃতি পঞ্চভূতের দ্বারা স্পৃষ্ট হইতে হইবে, এজন্য ক্রন্দন করে। একেবারে পঞ্চভূত-সংস্পর্শ-বিহীন হইয়া ছিল, কিন্তু জন্মমাত্র বায়ু, আলোক প্রভৃতির স্পর্শে কষ্ট অনুভব করিয়া ক্রন্দন করে। যে বাড়ীতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহারা তখন সকলে হর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে, কারণ সে একটী নূতন লোক আসিল, তাহাকে তাহারা ভালবাসিতে পারিবে ও সে তাহাদের প্রতি ভালবাসা দেখাইতে পারিবে। বৃদ্ধ বয়সে সে তাহাদের প্রতিপালক হইবে, ও ভবিষ্যতে তাহাদের বংশের উন্নতি ও মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবে, এই সকল স্মরণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে। হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, পুত্রহীন পিতা মাতাকে নিরয়গামী হইতে হয়, সুতরাং পুত্রই উদ্ধারকর্ত্তা, এই জন্য তাহারা সন্তানের জন্মগ্রহণে হর্ষ প্রকাশ করে। তৎপরে সে যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন সে প্রকৃত হাসে না, কারণ মৃত্যুসময়ে মনুষ্যের মুখ বিকৃত হয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়, সুতরাং ঐ মুখবিকৃতিকে সাধারণে হাসি বলিয়া কল্পনা করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা হাসি নয়, কেবল মৃত্যুসময়ের মুখবিকৃতি মাত্র। জগতের লোক তাহার মৃত্যু দর্শনে ক্রন্দন করে, কারণ তাহাদের এক জন নিকটস্থ প্রিয় আত্মীয় বিয়োগ হইল। তাহার প্রতি সকলেই মমতা-পরবশ ছিল, তাহাকে সকলেই ভালবাসিত, সে সকলের একমাত্র আশা ভরসা, নয়নের মণি ও জীবনের লক্ষ্য, এবং আদরের বস্তু ছিল। যে তাহার স্নেহ মমতা দ্বারা সকলকে বশীভূত ও আকৃষ্ট করিয়াছিল সেই প্রিয় বস্তুর বিয়োগে, সেই আদরের সামগ্রী সকল মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রস্থান করিল, এই ভাবিয়া সকলে ক্রন্দন করিতে থাকে ও নিয়তির অপূর্ব্ব বিধানের উপর দোষারোপ করে।

এই প্রবাদটীর উপরি-উক্ত দুই ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ এই প্রবাদটীর সমস্তই সত্য। যে ভাবে ব্যাখ্যা করিবে সেই ভাবের মধ্যেই এমন একটী বিশেষত্ব আছে যে, তাহা দ্বারা মনুষ্যের মন আকৃষ্ট হয় ও জগতের লোকের উপকার হয়। যে গ্রন্থে ইহা লিখিত, সে গ্রন্থ যে জগতের মধ্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ তাহার লেখককে ও যে দেশে লিখিত হইয়াছে, সেই পারস্য দেশকে বিপুল গৌরবে ভূষিত করিয়াছে, ও ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে একটী অমূল্য নিধি স্বরূপে পরিগণিত হইয়াছে। উক্ত উপদেশ দ্বারা জগতের যে কি সুমহৎ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত।

কুমারী মণিকা রায় চৌধুরী।

গোলাপ।

ফুলের যত প্রকার গুণ থাকা আবশ্যক, গোলাপের মধ্যে সে সকল গুলিই বর্ত্তমান। ইহার সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই। পারস্য ভাষায় গুল অর্থাৎ "ফুল" বলিলে (the flower) গোলাপকে বুঝায়; অন্য ফুলের নাম করিতে হইলে গুলের সহিত একটী বিশেষণের আবশ্যক, যথা—গুল-মখমল, গুল-সবেবা ইত্যাদি। ইংলণ্ড এবং পারস্যের কবিগণ সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া গোলাপের সহিতই তাহার তুলনা করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে গোলাপ ছিল না, থাকিলে ভারতীয় কবিগণও গোলাপকে পদ্মের ন্যায় উচ্চ স্থান প্রদান করিতেন।

পদ্মের শোভা স্বভাবের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে জড়িত, ইহা যত্নের অপেক্ষা করে না, সরোবর এবং হ্রদে আপনা আপনিই জন্মিয়া থাকে এবং ফুটিয়া চারি দিক আলোকিত করে। জনশূন্য স্থানে, কেহ দেখুক বা নাই দেখুক, ইহা চারি দিকে সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার যশ কীর্ত্তন করে। প্রস্ফুটিত পদ্মফুলে শোভিত সরোবর বা হ্রদ দেখিলে হৃদয় মন পবিত্র হয়। পদ্মের পবিত্রতাপূর্ণ সৌন্দর্য্যে ভারতীয় কবিগণ মুগ্ধ হইয়া যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু পবিত্র তাহাই পদ্মের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

একটী উৎকৃষ্ট এবং সুপ্রস্ফুটিত গোলাপ এবং একটী পদ্মফুল লইয়া তুলনা করিলে পাঠক বোধ হয় গোলাপকেই উচ্চ স্থান দিবেন। গোলাপের একটী ফুলেই যেন চারি দিক আলো করে এবং ইহার স্নিগ্ধ সৌরভে প্রাণকে আমোদিত করে। কিন্তু পদ্ম যেমন আদর ও যত্নের অপেক্ষা করে না, গোলাপ সেরূপ নহে। গোলাপ গাছের-বিশেষ যত্ন করিলে তবে উৎকৃষ্ট ফুল পাইবার আশা করা যাইতে পারে। গোলাপ সুরক্ষিত উদ্যানের বস্তু, মানুষের যত্নে প্রতিপালিত।

এমন সুন্দর ফুলের গাছ সকল গৃহস্থের বাটীতেই থাকা আবশ্যক। বাটীর সংলগ্ন ভূমি না থাকিলেও টব বা গাম্‌লাতে গোলাপ গাছ রাখা যাইতে পারে। টব বা গামলায় রাখিতে হইলে ১ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট টব বা গাম্‌লাই উপযোগী। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গোলাপের সর্ব্বশুদ্ধ এক বা দুই ডজন গাছ থাকিলেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারা যায়।

বাঙ্গালা এবং বেহারের মৃত্তিকা গোলাপের পক্ষে উপযোগী। উত্তর পশ্চিম এবং পঞ্জাবেও গোলাপ উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। যত্ন করিলে গোলাপ সকল স্থানেই উৎপাদন করা যাইতে পারে।

মুসলমান রাজাদিগের আধিপত্যকালেই বোধ হয় গোলাপ সর্ব্বপ্রথম এদেশে আনীত হয়। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত বস্‌রাই

প্রভৃতি অল্প কয়েক প্রকার মাত্র গোলাপ এদেশে জন্মিত। ইংরাজদিগের সময়ে বিদেশ হইতে নানাপ্রকার গোলাপ আনীত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে অসংখ্য প্রকারের গোলাপ এদেশে জন্মিয়া থাকে। সে সকলের নাম পাঠকপাঠিকাগণের গোচর করিবার কোন্ প্রয়োজন নাই। যে যে প্রকারের অল্পসংখ্যক উৎকৃষ্ট গোলাপ বাটীতে বা উদ্যানে রাখিলে সুগন্ধ ও সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারা যায়, তাহাদেরই তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—

ক। লাল গোলাপ—

১। Monte Cristo—মণ্টি ক্রিষ্টো। ইহার বর্ণ খুব ঘোরাল লাল, অনেক সময় রং কাল বলিয়া মনে হয়। ইহার বড়, ঘনদল, সুগন্ধবিশিষ্ট ফুল হয়।

২। Black Prince—ব্লাক প্রিন্স। ইহার রং খুব ঘোরাল লাল। অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত ফুল অতি সুন্দর। ফুলটী সমস্ত ফুটিয়া গেলে ইহার রং তত ঘোরাল থাকে না। ইহার ফুলও খুব বড় এবং সুগন্ধবিশিষ্ট হয়।

৩। Paul Nero—পল নিরো। ইহার ফুল সর্ব্বাপেক্ষা বড় হয়। রং গোলাপী, ফুল সুগন্ধবিশিষ্ট।

৪। La France—লা ফ্রান্স। গোলাপী রং, বড় সুগন্ধি ফুল। বারমাসই ফুল হয়।

৫। Damask Rose—বস্‌রাই গোলাপ।

৬। Reine Marie Henrietta—রেন মেরী হেনরিয়েটা—লাল লতানে গোলাপ।

৭। Rose Edward—রোজ এডওয়ার্ড—সুন্দর গোলাপী রং।

খ। হল্‌দে গোলাপ—

১। Marchal Neil—মার্শেল নিল। ইহার গাছ লতানে হয় এবং গাছে অসংখ্য ফুল হয়। অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত ফুল অতি সুন্দর। ইহার গন্ধ স্নিগ্ধ।

২। Augusta Vacher—আগষ্টা ভাচার। ফুলের বর্ণ তামার ন্যায়। অতি সুন্দর।

৩। Gloire de Dijou—গ্লয়ার ডি ডিজো। ইহার গাছ এবং ফুল মার্শেল নিলের ন্যায়।

গ। সাদা গোলাপ—

১। Acidah (Tea rose)—এসিডা টিরোজ—স্নিগ্ধগন্ধবিশিষ্ট।

২। Citrodora—সাইট্রোডোরা—লতানে গাছ। অনেক ফুল হয়। এই গাছ অতি শীঘ্র হয় এবং ইহার ফুল অতি সুন্দর।

৩। Madame Noman—ম্যাডাম নোমান—ছোট গাছ, ফুল অধিক হয়।

৪। La Marquis—লা মার্কুইস—সাদা লতানে গোলাপ। অনেক ফুল হয়।

উক্ত কয়েক প্রকার গোলাপের মধ্যে বাছিয়া ইচ্ছামত গাছ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

নবেম্বর মাস গোলাপ রোপণের প্রশস্ত সময়। গাছ রোপণের সাধারণ নিয়ম এই যে, যে গাছের যে ঋতুতে নূতন পাতা ও ডাল বাহির হয়, সেই গাছ সেই ঋতুতে রোপণ করিতে হয়। নবেম্বর মাসে গোলাপ গাছের নূতন পাতা বাহির হয় ও স্বভাবতঃই গাছের তেজ হয়। সুতরাং এই সময়ই ইহা রোপণের উপযুক্ত সময়। অপর সময়ে যে গাছ রোপণ করা যাইতে পারে না এরূপ নহে, তবে তাহা অপেক্ষাকৃত যত্নসাধ্য।

গোলাপ গাছ প্রথম রোপণ করিবার সময় কোন প্রকার সার না দেওয়াই ভাল। কারণ গাছের প্রথম অবস্থায় সার দিলে তাহাতে উই ধরিবার সম্ভাবনা থাকে। এতদ্ব্যতীত গাছের অবস্থানুযায়ী যতটুকু আহার প্রয়োজন, তাহার অতিরিক্ত সার থাকায় গাছ ভাল হয় না। গাছ রোপণের পর মাটীতে গাছ লাগিয়া গেলে, তাহাতে প্রথমে অল্প অল্প পরিমাণে জলীয় সার দেওয়াই ভাল। পরে গাছ যেমন বড় হইবে, সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। এক বৎসরের পুরাতন গাছে ইচ্ছামত সার দেওয়া যাইতে পারে। গাছ নূতন রোপণ করিবার পর গোড়ার মাটী ফাটিয়া গেলে তাহা খুলিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, নতুবা ফাট দিয়া বাতাস গিয়া গাছকে নষ্ট করিয়া দিবে।

গোলাপের পক্ষে গোবরই উৎকৃষ্ট সার। নূতন গাছে পাতা সার বা পুরাতন গোবরের সার জলে গুলিয়া সেই জল দিতে হইবে। পুরাতন গাছের গোড়ায় মাটী সরাইয়া সেই স্থানে সার পুতিয়া দিতে হইবে। পুরাতন গাছের গোড়ায় টাট্‌কা গোবর দিয়া উচ্চ হইতে সেই স্থানে জল ঢালিয়া দিলে খুব বড় এবং সুগন্ধি ফুল হয়।

একটী কলসীতে টাট্‌কা গোবর জলে গুলিয়া রাখিয়া সেই জল স্থির হইলে উপরের জলীয় ভাগ গাছের গোড়ায় দিতে হইবে এবং অবশিষ্ট গোবরে পুনরায় জল দিয়া রাখিয়া এক সপ্তাহ পরে পুনরায় সেই জল দিতে হইবে। এইরূপে কলসীর গোবর ৩।৪ সপ্তাহ ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই প্রকার সারে খুব উপকার হয় এবং ফুল খুব ভাল হয়।

হাড়ের গুঁড়া গোলাপ গাছে দিবার নিয়ম এই যে, আষাঢ় শ্রাবণ মাসে এক ভাগ হাড়ের গুঁড়া ও দুই ভাগ গোবর জলে মিশাইয়া একটী কলসীতে রাখিয়া ৩ মাস পচাইতে হইবে। এমোনিয়া গ্যাস উড়িয়া না যায়, এই জন্য কলসীর মুখে ঢাকা দেওয়া প্রয়োজন। এমোনিয়া অতি উপকারী সার। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ঐ মিশ্রিত সার অবস্থানুসারে গোলাপ গাছের গোড়ায় দিতে হইবে।

গোলাপ গাছে সার দিবার পক্ষে নবেম্বর মাসই উৎকৃষ্ট সময়। এই সময় গাছের গোড়া খুরপী দিয়া খুঁড়িয়া দিয়া তাহার মাটী সরাইয়া দিতে হইবে, তাহাতে গাছের গোড়ায় ও শিকড়ে শিশির ও

রৌদ্র লাগে। এইরূপে দুই সপ্তাহ কাল শিশির ও রৌদ্র খাওয়াইয়া তৎপরে সেই খনিত স্থান সার দিয়া পূর্ণ করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যে সকল গাছ এক বৎসরের অধিক পুরাতন, তাহাতেই এই প্রকারে সার দিতে হইবে। নূতন গাছে এরূপ গোড়া খুঁড়িয়া সার দিলে গাছ মরিয়া যাইবে।

মন্টিক্রষ্ট প্রভৃতি ঘোরাল রং বিশিষ্ট ফুল গাছের গোড়ায় লৌহচূর্ণ দিলে ফুলের রং খুব ভাল হয়। একটা লৌহের পেরেক গোড়ার মাটীতে পুতিয়া দিলেও চলিতে পারে।

ডাল কাটা।

লতানে গোলাপ এবং Tea Rose ব্যতীত আর সকল গোলাপ গাছের প্রতি বৎসর ডাল কাটা আবশ্যক। ডাল না কাটিলে ভাল ফুল হয় না। নবেম্বর মাসে যে সময় গাছের গোড়ার মাটী সরান হয়, সেই সময় গাছের ডাল কাটিয়া দিতে হইবে। দুই বৎসরের অধিক পুরাতন ডালগুলি একেবারে নির্ম্মূল করিয়া কাটিতে হইবে। অপর ডালগুলি দেড় হাত রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। একটা গাছে ৩।৪ টার অধিক ডাল না রাখাই ভাল। যে সকল গাছ নূতন রোপণ করা হয়, তাহার ডাল কাটিতে নাই। গাছ এক বৎসরের পুরাতন হইলে ডাল কাটিবার উপযুক্ত হয়।

কিন্তু লতানে গোলাপের এবং Tea Rose-এর ডাল কাটিলে গাছ নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাতে ফুল ভাল হয় না। এ সকল গাছের কেবল শুষ্ক ডালগুলি কাটিয়া দিতে হয় এবং গোড়ায় ঝোপ হইলে ডাল কাটিয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, গোলাপ গাছে উৎকৃষ্ট ফুল পাইতে হইলে নবেম্বর হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত নিয়মগুলি রক্ষা করা আবশ্যক—

১। নবেম্বর মাসে গাছের ডাল কাটা এবং গোড়া খুঁড়িয়া মাটী সরাইয়া দেওয়া।

২। দুই সপ্তাহ কাল গাছের গোড়ায় শিশির এবং রৌদ্র খাওয়ান।

৩। দুই সপ্তাহ পরে গাছের গোড়া সার দ্বারা পূর্ণ করা এবং গোড়া এরূপ ভাবে গাম্লার ন্যায় করিয়া দেওয়া যে, তাহাতে জল দিলে জল গোড়ায় বসিতে পারে।

৪। গোড়ায় কাঁচা গোবর দিয়া উচ্চ হইতে জল ঢালা, অথবা কলসীতে জল দিয়া গোবর গুলিয়া গাছের গোড়ায় সেই জল দেওয়া। এইরূপ জল সপ্তাহে একবার বা দুইবার করিয়া দিতে হইবে।

৩। ৩।৪ দিন অন্তর গাছের গোড়া খুলিয়া দেওয়া আবশ্যক।

৬। এক দিন অন্তর গাছের গোড়ায় জল যথেষ্ট পরিমাণে দিতে হইবে।

৭। শুষ্ক ফুলগুলি বোঁটা শুদ্ধ কাটিয়া দিতে হইবে। গাছে অধিক কুঁড়ি ধরিলে তাহার কতকগুলি কাটিয়া দিতে হইবে।

৮। লতানে গোলাপ ও Tea Rose-

এর পক্ষে ডাল কাটা ব্যতীত উক্ত সকল প্রকার নিয়ম রক্ষা করা আবশ্যক।

বসরাই এবং দেশী গোলাপের ডাল ডিসেম্বর বা জানুয়ারী মাসে ছাঁটিলেই ভাল হয়। কারণ ইহাদের ফুল নাবি হয় এবং এই জন্য ইহাদের ডাল কাটা ও গোড়ায় সার দেওয়া বিলম্বে হইলেই ভাল হয়।

উক্ত প্রকারের নিয়মগুলি পালন করিলেই উৎকৃষ্ট ফুল পাইতে পারা যায়।

গোলাপের কলম।

গোলাপের কলম প্রস্তুত করা অতি সহজ। নিজের গোলাপ গাছ হইতে ইচ্ছা করিলেই অনেক কলম করা যাইতে পারে। নিম্নে কয়েক প্রকার সহজ উপায় লেখা হইল।

১। নবেম্বর মাসে যখন গোলাপ গাছের ডাল কাটা হইবে, সেই সময় ডালগুলি হইতে এক বৎসরের বা তাহা অপেক্ষা অল্প পুরাতন ডাল বাছিয়া লইয়া সেই ডালগুলি ৪ ইঞ্চ লম্বা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিতে হইবে। পরে সেই টুক্‌রাগুলি একত্রে আটি বাঁধিয়া কোন শীতল স্থানে আটিটী সোজা ভাবে অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত মাটীতে পুতিয়া একমাস কাল রাখিতে হইবে ও প্রতিদিন তাহাতে জল দিতে হইবে। কিছু দিনের মধ্যে সেই টুক্‌রাগুলি কতক শুকাইয়া যাইবে এবং কতকগুলি হইতে নূতন শাখা ও পত্র বাহির হইবে। এক মাস পরে আটিটী খুলিয়া যে টুক্‌রাগুলি সতেজ আছে দেখিবেন, সেইগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া একটী ছায়াযুক্ত কেয়ারিতে ৬ ইঞ্চ অন্তর অন্তর সারবন্দী করিয়া রোপণ করিবেন এবং কেয়ারিতে প্রত্যহ জল দিবেন। গাছগুলি এই ভাবে পরবর্ত্তী নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত কেয়ারিতে থাকিবে। কেয়ারিতে যে সকল গাছ হইবে, তাহা নবেম্বর মাসে গাম্‌লায় বা অন্য স্থানে রোপণ করা যাইতে পারে।

উপরি-উক্ত প্রকারের টুক্‌রাগুলি, আটি খোলার পর কেয়ারিতে রোপণ না করিয়া যথাস্থানেও রোপণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রতিদিন জল দিতে এবং তাহার উপর কোন প্রকারে ছায়া করিয়া দিতে হয়।

২। Gigautia—জাইগানসিয়া নামক এক প্রকার জঙ্গলী গোলাপ আছে, তাহার ফুল থলো থলো ও ছোট আকারের হয় এবং তাহার গাছ লতানে হয় ও অতি সহজে তাহার বৃদ্ধি হয়। উক্ত গোলাপের ডাল কাটিয়া উপরি-উক্ত প্রকারে গাছ করিয়া সেই গাছ গাম্‌লায় বসাইয়া ভাল গোলাপ গাছের নিকট রাখিয়া জোড় কলম বাঁধিতে হয়। বর্ষাকালই জোড় কলম বাঁধিবার প্রশস্ত সময়। গাম্‌লার গাছের ডালের অল্প অংশ চাঁচিয়া, এবং গোলাপের যে ডালের কলম বাঁধা হইবে তাহার অল্প অংশ চাঁচিয়া, উভয় ডালের সেই চাঁচা অংশ একত্র করিয়া সূতা দিয়া বাঁধিতে হইবে। কিছু দিন পরে দুইটী ডাল সেই স্থানে জোড়া লাগিয়া

যাইবে। যখন দেখা যাইবে যে, ডাল দুইটী বেশ জোড়া লাগিয়াছে এবং জোড়ের স্থানটী গাঁটের ন্যায় হইয়াছে, সেই সময় মূল গাছের ডালের জোড়ের নিম্নের স্থানটী অল্প কাটিয়া দিতে হইবে। এক সপ্তাহ পরে পুনরায় একটু কাটিতে হইবে। তাহার পর আর এক সপ্তাহ পরে ডালটী একেবারে কাটিয়া দিতে হইবে। তখনও গামলাটীকে সে স্থান হইতে সরান উচিত নহে। কারণ এক স্থানে থাকিলে গাছে কোন ঝোঁক লাগে না। কিছু দিন পরে মূল গাছের ডাল জোড়ের উপর ৩ ইঞ্চ রাখিয়া কাটিয়া দিতে হইবে। এই সকল প্রক্রিয়ার পর যখন গাছ বেশ সতেজ দেখা যাইবে, তখন অন্যত্র লইয়া যথেচ্ছ স্থানে রোপণ করা যাইতে পারে।

জোড় কলম বাঁধিতে হইলে গামলার মাটীর নিকট ঘেঁসিয়া জোড় বাঁধাই ভাল। তাহা হইলে মূল গাছের ডাল বাহির হইতে পারে না, কলমের ডালই শীঘ্র সতেজ হয়। জোড় কলম বাঁধিবার সময় বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন মূল গাছের ডাল বাহির হইতে না পায়, বাহির হইলেই তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। মূল গাছের ডাল পালা বাহির হইতে দিলে কলমের ডালটী মরিয়া যাইবে।

৩। গাছের ডাল নোয়াইয়া মাটী চাপা দিলে ২ মাস বা ২॥ মাস পরে সেই স্থানে শীকড় বাহির হয়। তখন অল্পে অল্পে উপরি-উক্ত প্রকারে গাছের দিকের ডালটি কাটিয়া দিতে হইবে। এই প্রকারে কলম করাকে ইংরাজিতে layering বলে। এই প্রকার কলম গামলাতেও করা যাইতে পারে। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময় করিতে হইলে, সর্ব্বদা জল দেওয়ার আবশ্যক হয়। জল দিবার জন্য একটী উপায় করা যাইতে পারে—যথা একটী গামলায় অর্দ্ধেক অংশ মাটী দিয়া ভরিয়া তাহা layering-এর উপর রাখিয়া দিতে হইবে এবং বাকী অংশ জল দিয়া ভরিয়া দিতে হইবে। এইরূপে জল দিলে সর্ব্বদাই কলমের স্থানটী ভিজিয়া থাকে এবং তাহাতে শীঘ্র শীকড় বাহির হয়। ডালের যে স্থানটী মাটী চাপা দিয়া কলম করা হইবে, সে স্থানটী কলম করিবার পূর্ব্বে ছুরি দিয়া একটু চাঁচিয়া দিলে, শীঘ্র সেই স্থানে শীকড় বাহির হয়।

৪। চোক কলম—(Budding)—একটী গোলাপ গাছের পুরাতন ও মোটা ডালের গোড়ার দিক হইতে ধারাল ছুরি দ্বারা একটী সতেজ চোক খানিকটা কাষ্ঠ-সহ কাটিয়া লইতে হইবে। তৎপরে সেই কাষ্ঠের অংশটুকু ছুরির ফলা দিয়া তুলিয়া ফেলিয়া অপর একটী গোলাপ গাছের ডালে সেই চোকের পরিমাণ ছাল উঠাইয়া লইয়া সেই স্থানে চোকটী বসাইয়া সুতা দিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। চোকটী বসাইবার পূর্ব্বে মুখের ভিতর রাখিয়া দিলে রৌদ্রে ও বাতাসে উহা নষ্ট হয় না। যে স্থানে চোকটী বসাইতে হইবে, সেখানেও অল্প থুতু মাখাইয়া দিতে হইবে। চোকটী বসান

হইলে ধারগুলি মোম দিয়া মুড়িয়া দিলে ভাল হয়, কিন্তু যেন চোকের অংশটী ঢাকা না পড়ে। চোক কলমে একটী গাছে অনেক প্রকারের গোলাপ ফুল ফুটাইতে পারা যায়। চোক কলম শীত এবং বর্ষা এই দুই সময়েই ভাল হয়। ইহার জন্য Gigantia গাছ সুবিধাজনক নহে। ভাল গোলাপের ডালেই চোক কলম বাঁধিতে হয়।

৫। নবেম্বর মাসে গোড়ার মাটী সরাইয়া দিবার সময় গোলাপ গাছের গোড়া হইতে শীকড় সহ ডাল বাহির করিয়া লইলেও তাহা হইতে গাছ করা যাইতে পারে।

৬। গুল কলম—আষাঢ় শ্রাবণ মাসে গোলাপ গাছের গুল কলম করাও অতি সহজ। এক বৎসরের অধিক পুরাতন একটী ডাল লইয়া তাহার একটী চোখের বা গাঁটের নিম্নে দুই ইঞ্চ পরিমাণ স্থানে ডালের ছাল ছুরি দিয়া তুলিয়া ফেলিতে হইবে। অনন্তর সারযুক্ত মাটীর দুইটী ডেলা পাকাইয়া তাহার দ্বারা সেই চোক বা গাঁট এবং ছাল তোলা অংশের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ঢাকিয়া দিতে হইবে। ছালেতে অংশের বাকী অর্দ্ধেকে যেন মাটি না লাগে। পরে নারিকেলের ছোব্‌ড়া দিয়া সেই মাটী ঢাকিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। বর্ষার জল লাগিয়া সেই স্থান হইতে শিকড় বাহির হয়। আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে ঐ কলম কাটিয়া গাছ হইতে পৃথক্ করিয়া ছায়াযুক্ত স্থানে রোপণ করিতে হইবে।

গোলাপ ফুল শুধু যে শোভা সম্পাদন করে, এমন নহে। দেশী গোলাপের পাপড়ীতে সরবত ও গুলকন নামক Syrup প্রস্তুত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে মিছ্‌রির সহিত গোলাপের পাপ্‌ড়ী বাটিয়া সরবত করিয়া খাইলে শরীর স্নিগ্ধ হয়। দেশী গোলাপের পাপড়ী চিনির সহিত পাক করিলেই গুলকন নামক Syrup প্রস্তুত হয়। এই Syrup আবশ্যক মত জলের সহিত মিশাইয়া সরবত করিয়া খাইলে তাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে ও শরীর স্নিগ্ধ করে। দেশী গোলাপের পাপড়ী শুকাইয়া রাখিলে উক্ত কার্য্যে লাগিতে পারে।

দেশী গোলাপকে মান্দ্রাজী গোলাপও বলে। ইহার ফুল প্রায় বার মাসই হয়। তবে বসন্তকালেই ইহার ফুল বেশী হয়।

বসরাই গোলাপে গোলাপজল, আতর প্রভৃতি হইয়া থাকে। গোলাপের পাপড়ী জলে দিয়া সেই জল বক-যন্ত্রে চোয়াইয়া লইলেই গোলাপজল হইল। সেই জলের উপর যে তৈলাক্ত পদার্থ ভাসিয়া থাকে তাহাই গোলাপী আতর। পালক দিয়া তাহা তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আশা করি, পাঠকপাঠিকাগণ গাম্‌লায় বা উদ্যানে গোলাপ গাছ পালন করিয়া গৃহে গৃহে এই উৎকৃষ্ট ফুল প্রচুর পরিমাণে পাইবেন এবং যিনি এই অতুলনীয় পুষ্প মানুষের জন্য সৃজন করিয়াছেন তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত, বি, এল।

প্রলোভন।

সর্ব্বজ্ঞানময় বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গলময়ী ইচ্ছানুসারে আমরা জন্মাবধি প্রলোভন ও ও ক্লেশরাশি দ্বারা বেষ্টিত। তিনি আমাদিগকে এরূপ এক জগতে স্থাপন করিয়াছেন, যেখানে অন্যায় কর্ম্মই প্রায়শঃ সুফলপ্রদ, কর্ত্তব্যকর্ম্ম কঠিন ও ক্লেশকর, যে স্থানে বিবেকধ্বনি বহুজন দ্বারা প্রতিবাধিত, যে স্থানে শরীর আত্মার উপর অযথা ভারার্পণ করে, এবং যে লোকে বাহ্য বস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়গণের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া আধ্যাত্মিক জগতের ও আমাদিগের মধ্যে এক মহা আবরণ বিস্তার করে। আমরা এরূপ প্রভাব সকলের মধ্যে বাস করিতেছি যে, তাহা সর্ব্বদাই আমাদিগের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও দুর্ব্বল চিত্তকে ভীত করিতেছে। এই সমুদায় হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইতে হইলে, ইহাদিগকে জয় করা ভিন্ন অন্য গতি নাই।

১। যতদিন আমরা এই পার্থিব প্রবাসে অবস্থান করি, ততদিন আমরা প্রলোভন ও বিবিধ পরীক্ষার হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হই না। এই জন্যই কথিত হইয়াছে—মানবের পার্থিব জীবন প্রলোভনময়, "The life of men upon earth is tempetation."* অতএব যাহাতে এই দুরাচার পাপ রিপুর করাল কবল হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, তজ্জন্য প্রত্যেক মনুষ্যেরই স্ব স্ব প্রলোভন সকলের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পাপ কদাচ বিশ্রাম করে না, কিন্তু সর্ব্বদাই কাহাকে আক্রমণ করিবে এই অন্বেষণেই ব্যস্ত। মহাত্মা পিটার (Peter) বলিয়াছেন "Be sober, be vigilant; because your adversary, the devil as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour."* ইহলোকে যিনি যত বড় সাধুই হউন না কেন, এরূপ কেহ নাই যিনি কখনও না কখন প্রলোভনে প্রলুব্ধ হন নাই। ক্ষুদ্র আমরা তবে কিরূপে ইহার হস্ত হইতে মুক্ত হইব?

২। প্রলোভন ও পরীক্ষা সকল অতীব কষ্টদায়ক হইলেও ইহার দ্বারা মানুষের প্রকৃষ্ট উপকার সাধিত হয়। কারণ, প্রলোভনই মানবকে আত্মত্যাগ শিক্ষা দেয় ও নম্র করে, ইহা দ্বারাই মনুষ্য পরিশুদ্ধ হয় এবং ইহাই তাহাকে প্রকৃষ্ট উপদেশ প্রদান করে।

জগতের সকল সাধু মহাত্মা পাপ প্রলোভন এবং ক্লেশ ও নির্যাতনের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন এবং এই সকল দ্বারাই তাঁহাদিগের চির-মঙ্গল লাভ হইয়াছে। যাহারা ইহাদিগকে প্রতিরোধ

* Bible. Book of Job.

* 1. Peter. 5, Verse 8.

করিতে পারে নাই, তাহারা দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া জগতে অখ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং চিরতরে বিনাশপাথারে নিমগ্ন হইয়াছে।

৩। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ইহ জগতে এরূপ ধর্ম্ম নাই, এরূপ স্থান নাই, যথায় প্রলোভন প্রসারিত হয় নাই, বা যথায় ক্লেশের সঞ্চার নাই। অদ্যাবধি এরূপ মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করেন নাই, যিনি প্রলোভনে পতিত হয়েন নাই। প্রলোভনের বীজ আমাদিগের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে, এবং তাহা হইতেই আমাদিগের ইচ্ছায় কুপ্রবৃত্তি জন্ম গ্রহণ করে। যখনই আমরা একটী প্রলোভন হইতে মুক্তিলাভ করি, অমনি অন্য আর একটী আসিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এইরূপে, মনুষ্য-জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি বলিয়াই আমা-দিগকে প্রতিনিয়তই কিছু না কিছু কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

৪। অনেকে প্রলোভন হইতে দূরে অবস্থান করিতে প্রয়াস পাইয়া তদ্দ্বারা অধিকতর আকৃষ্ট হয়েন। পলায়ন দ্বারা প্রলোভন অতিক্রম করা দুরূহ, কিন্তু ধৈর্য্য, মানসিক শান্তি এবং আত্মবলিদান দ্বারাই কেবল আমরা প্রলোভনকে পরাভূত করিতে পারি।

অন্তরস্থিত প্রলোভনকে সমূলে উৎপাটন করিতে প্রয়াস না পাইয়া, যিনি বাহ্যিক ভাবে প্রলোভন হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে যত্ন করেন, তিনি ইহা দ্বারা কোনও উপকার প্রাপ্ত হয়েন না। কারণ প্রলোভন পর মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে আকর্ষণ করে, এবং তিনি তখন নিজেকে অধিকতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত মনে করেন।

অল্পে অল্পে, দীর্ঘ ক্লেশ সহ্য করিয়া, ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবৎকৃপায়, সহজেই প্রলোভনকে অতিক্রম করা যায়, কিন্তু কেবল কঠোরতা বা আত্মচেষ্টা অবলম্বনে ইহা সুদূরপরাহত। প্রলোভনকালে সাধু-জনের উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু প্রলুব্ধ ব্যক্তির প্রতি কদাচ কর্কশ ব্যবহার করা উচিত নহে। তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করা কর্ত্তব্য, কারণ ঐরূপ অবস্থায় আমরাও ঐরূপ আকাঙ্ক্ষা করি।

মানসিক অস্থিরতা (চাঞ্চল্য) এবং ভগবানের প্রতি অবিশ্বাস প্রলোভনের বীজ। ক্ষেপণীবিহীন তরী যদ্রূপ বীচিবিক্ষোভিত সাগরগর্ভে তরঙ্গাঘাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়, তদ্রূপ অসাবধান, অস্থিরপ্রতিজ্ঞ নর প্রলোভনোর্ম্মিদ্বারা জীবনসমুদ্রে আলোড়িত হয়।

৫। অগ্নি যদ্রূপ লৌহকে পরীক্ষা করে, প্রলোভনও তদ্রূপ সাধুর সাধুত্ব পরীক্ষা করে। অনেক সময় আমরা আমাদিগের ক্ষমতা বুঝিতে পারি না, কিন্তু প্রলোভন আমাদিগকে তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়া দেয়, দেখাইয়া দেয়।

তথাপি প্রলোভনের প্রতি আমাদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। বিশেষতঃ প্রলোভনের প্রথমাবস্থায় বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া উচিত। দুর্দ্দম রিপুকে বশি

হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না দেওয়া হয়, এবং হৃদয়-দুয়ারে আঘাত করিবার পূর্ব্বেই বাধা প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তখনই ইহা সুপরাজেয়। এই জন্যই একজন বলিয়াছিলেন—প্রারম্ভে বাধা দাও, বিলম্বে বৈদ্যের আবশ্যক "Beginnings check, too late is physic sought."* ।

কারণ আমরা দেখি যে, সর্ব্বাগ্রে একটী অশরীর, অস্পষ্ট, কুভাব আমাদিগের মনোমধ্যে উদিত হয়, তাহার পর তৎপ্রতি আমাদিগের গভীর চিন্তা জন্ম লাভ করে। সেই চিন্তাই মোহ উৎপাদন করিয়া তাহাতে (অপ্রকৃত) আনন্দ জন্মাইয়া দেয়, এবং তাহাতেই কুকার্য্যে চেষ্টা হয় এবং অবশেষে আমরা তাহাতে সম্মতি প্রদান করি। যদ্রূপ অশ্বরশ্মি শ্লথ করিয়া দিলে, অশিষ্ট অশ্ব তাহার আরোহীকে দ্রুত হইতে দ্রুততর বেগে কুপথে লইয়া যায়, তদ্রূপ দুর্দ্দমনীয় রিপুকুল সংযমন না করিলে মানবাত্মাকে ইহা কুপথে পরিচালিত করে। মনুষ্য প্রলোভনকে বাধা দিতে যতই বিলম্ব করে, দিন দিন সে ততই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং অবশেষে রিপুর দাসত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

৬। পৃথিবীতে আমরা দেখিতে পাই যে, কেহ কেহ ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই ভীষণ প্রলোভনে পতিত হয়, কেহ বা জীবনের অন্তিম কালে। কেহ বা সমগ্র জীবন হিংস্র রিপুর সহিত সংগ্রাম করেন, কেহ বা স্বীয় জ্ঞানানুসারে এবং ভগবন্নিয়োগের সাম্যানুসারে অল্পতেই প্রলুব্ধ হন। ভগবন্নিয়োগ মানবের অবস্থা, শক্তি ও গুণ বিবেচনা করিয়া জগতের কল্যাণের নিমিত্ত সমুদায় শাসন করে।

অতএব প্রলোভনে পতিত হইলেও আমাদিগের নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই, কিন্তু অধিকতর ব্যাকুলভাবে ঈশ্বরচরণে প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য—যাহাতে তিনি আমাদিগকে পরীক্ষা সকলের মধ্যে সাহায্য করেন। কারণ তিনি অবশ্যই আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। মহামতি St. Paul বলিয়া গিয়াছেন "He will give with temptation such issue, that we may be able to bear it." ভগবান্ প্রলোভনের সহিত এরূপ সামগ্রী প্রদান করিবেন, যদ্দ্বারা আমরা অনায়াসে তাহা সহ্য করিতে পারিব।

অতএব প্রত্যেক প্রলোভনে আমরা আমাদিগের আত্মা ভগবদ্হস্তে ন্যস্ত করি, কারণ তিনি বিনীত আত্মার উন্নতি সাধন করেন। পরীক্ষা ও প্রলোভন দ্বারাই মানুষের মনুষ্যত্বের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় এবং পুণ্যের পুরস্কার দর্শন করিয়া সেই মনুষ্যত্বের বিকাশ দৃঢ়ভাবে প্রতীত হয়। যে মানব দুঃখ ও ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন না অথচ গভীর বিশ্বাসী, তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় নাই।

* Ovid.

কিন্তু অপ্রতিকূল অবস্থাতে যদি তিনি ধৈর্য্যগুণে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন, তবেই তাঁহার আত্মার উত্তরোত্তর উন্নতির সম্ভাবনা।

অনেকে এরূপ আছেন, যে তাঁহারা দুর্দ্দম প্রলোভন সকল অতিক্রম করেন, কিন্তু সামান্য প্রলোভনের নিকট পরাস্ত হন। অবশেষে, তাঁহারা ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া গুরু কার্য্যের ভার আর গ্রহণ করিতে সক্ষম হন না।

যামিনীর আত্মকথা।

অনেক সময়ে দুঃখই মানুষের উন্নতির সোপান হয়। অভাব না হইলে ত চেষ্টা জাগে না। তাই আজ আমার পিতা অভিমানভরে, এই সামান্য অপমানের তাড়নায়, জ্যেষ্ঠের নিকট লাঞ্ছিত হইয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য এত ব্যগ্র হইলেন।

হেডমাষ্টার মহাশয় তাঁহাকে ভাল চক্ষুতে দেখিয়াছিলেন, অথবা তাঁহার মধ্যে এমন কোন গুণ ছিল যাহা দেখিয়া শিক্ষক মহাশয় ভবিষ্যতের আলো তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাইতেন।

হেড মাষ্টার মহাশয়ের সহানুভূতিসূচক স্বরে পিতার অন্তঃকরণ আরও দ্রব হইয়া গেল, কথা কহিবার পূর্ব্বে তাঁহার নয়ন অশ্রুতে ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু সহসা নিজেকে সংযত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন "মহাশয় আমার আর পড়িবার ইচ্ছা নাই, আমার একটি চাকরীর বন্দোবস্ত করিয়া দিন"। পিতা অতি নম্রভাবে এই কথা-গুলি কহিলেন। ছাত্রের এরূপ ভাবান্তর দেখিয়া শিক্ষক মহাশয় অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "সে কি, তুমি কি এখনি চাকরীর উপযুক্ত হইয়াছ? তুমি ত বালক হে, লেখা পড়াও কিছু তেমন হয় নাই, তোমাকে কে চাকরী দিবে"? এইরূপ নৈরাশ্যজনক বাক্যের উত্তরে পিতা কহিলেন—

"আমার অদৃষ্ট"।

এই কথার পর যখন তিনি উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন মাষ্টার মহাশয় তাঁহার হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিলেন "আচ্ছা সন্ধ্যার সময় আমার বাঙ্গালাতে এস"।

বিমর্ষ মনে পিতা বাড়ী আসিয়া মাতার প্রদত্ত আহার যথারীতি খাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভাবান্তর সকলেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পিতামহী অতি দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির রমণী ছিলেন। তিনি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "কেন রে আজ তোর কি হয়েছে, মাষ্টার কি বকেছেন না মেরেছেন, অমন হয়ে আছিস্ যে? পিতা এই সম্ভাষণের উত্তরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস

ফেলিয়া স্পষ্ট করিয়া অতি দৃঢ় স্বরে কহিলেন "আমি আর পড়িব না, স্কুলে যাইব না।" পিতার এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-সূচক বাক্য শুনিয়া পিতামহী দারুণ ক্রোধে তৎক্ষণাৎ কহিলেন "পড়্‌বি না, তবে যা দূর হ, আমার বাড়ীতে তোর স্থান নাই, আমি আর তোকে খেতে দিব না"।

এই নিষ্ঠুর বাক্য পিতার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি উঠিয়া সোজা গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

দিবসের শেষে সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়ায় উপবেশন করিলেন। সন্ধ্যাদেবী জগতে উপনীত হইলেন। দিনমান অবসান হইল, মানুষের দিবসের কার্য্যও স্থগিদ হইল, বিশ্রামের সময় আসিল।

আকাশে চন্দ্র তারকা উদিত হইয়া অবনীমণ্ডলের উপরিস্থিত গিরি, নদ, নদী ও বন, উপবনে রজত কিরণমালা দোলাইয়া জ্যোৎস্নাচ্ছটা প্রকাশ করিল। ঘরে ঘরে দীপাবলি জ্বলিল ও ধূপধূনার গন্ধে গৃহ আমোদিত হইল। দেবমন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি ও আরত্রিক বাদ্য বাদিত হইল এবং কর্পূরাসব ঘৃত প্রদীপে দেবতার চরণে আলোক উপহার প্রদত্ত হইল।

ঘরে বাহিরে বাজারে দোকানে সর্ব্বত্রই অন্ধকার বিদূরীত করিবার নিমিত্ত ধনী দরিদ্র সকলে যথাসাধ্য আলোক সাজাইয়া দিল।

মাষ্টার মহাশয়ের সুপ্রশস্ত বাঙ্গালা-খানি ল্যাম্পের আলোকে সজ্জিত হইল।

মাষ্টার মহাশয় পূর্ব্বের নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহার আফিসঘরে ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে দ্বারবান্ আসিয়া সম্বাদদিল "জনৈক ছাত্র আসিয়া আপনাকে সেলাম জানাইতেছে।"

দ্বারবান্ ছাত্রকে লইয়া যাইতে আদিষ্ট হইলে বাহিরে আসিয়া পিতাকে সঙ্গে লইয়া মাষ্টার মহাশয়ের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া বিদায় হইল।

তথায় অতি স্নেহ ও যত্নের সহিত পিতা আসন পাইলেন। এ স্কুল নহে, এখানে গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ স্বতন্ত্র, এখানে শিষ্য শিক্ষার জন্য আইসে নাই। এখানে যেন পিতা পুত্রের মত আলাপ। হেডমাষ্টার মহাশয় অতিশয় মমতাসূচক নানাপ্রকার সদুপদেশ দিয়া পিতাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণে যে অদম্য বিরাগ জন্মিয়াছে, তাহা কিছুতেই নিবারিত হইল না। কেবল জ্যেষ্ঠের সেই কঠোর উক্তিটি যেন কাঁটার মত তাঁহার প্রাণে বিদ্ধ হইতেছিল। অবশেষে তিনি ক্ষোভে ও রোষে কাঁদিতে লাগিলেন।

ছাত্রের চক্ষুতে অশ্রুধারা দেখিয়া শিক্ষকের হৃদয়ে আরও দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি একজন আত্মীয় বন্ধুকে একখানি অনুরোধ-পত্র লিখিয়া পিতার হস্তে দিলেন।

সেই রাত্রিতে সুপারিশ-পত্র লইয়া পিতা বাড়ীতে ফিরিলেন। অপত্যবৎসলা জননী পুত্রকে তিরস্কার করিয়া, শেষে নিজেই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন ও যতক্ষণ ছেলে

বাড়ীতে ফিরিয়া আইসে নাই, কেবল ঘর বাহির করিয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যখন দেখিলেন ছেলে ঘরে ফিরিয়াছে, তখন আর তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। পুত্রকে কোলের কাছে বসাইয়া অনেক কথা কহিলেন, কিন্তু কিছুতেই ছেলের মন ফিরিল না।

যাহা হউক, সে রাত্রিতে আর কোন ঘটনা ঘটিল না। পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া পিতা আবার একবারে হেডমাষ্টার মহাশয়ের বাঙ্গালায় উপস্থিত। হেডমাষ্টার মহাশয় তাঁহাকে কহিলেন "তুমি কি করিয়া যাইবে?" তখন এদেশের সর্ব্বস্থানে রেলপথ হয় নাই।

পিতা উত্তর করিলেন "পদব্রজে"।

সে উত্তর হেডমাষ্টারের মনোমত হইল না। তিনি দশটি টাকা পিতার হাতে দিয়া বলিলেন এই লইয়া যাও, গরুর গাড়ীতে যাইলে ঘোড়ার গাড়ী অপেক্ষা কম পয়সা লাগিবে।

পিতা সেইখান হইতে জনক জননীকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া এক বস্ত্রে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। (ক্রমশঃ)

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভীষণ বন্যা—এ বৎসর বন্যায় প্রায় অৰ্দ্ধেক বঙ্গদেশ জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে। বৰ্দ্ধমান ও তাহার চারিপার্শ্বস্থ গ্রামসমূহ এবং তারকেশ্বর, হরিপাল, কাঁথি, বাঁকীপুর প্রভৃতি স্থান বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। কত শত প্রাণ যে বিনষ্ট হইয়াছে, কত মানুষ যে গৃহহীন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শুনা যায় ১২৩০ সালে একবার দামোদর নদে এইরূপ ভীষণ বন্যা হইয়াছিল, তাহাতে মগরা পর্য্যন্ত জল আসিয়াছিল, কিন্তু এবার এরানসোল্ পর্য্যন্ত জল গিয়াছে। প্রায় নব্বই বৎসরের মধ্যে এরূপ বন্যা দেখা যায় নাই। দামোদর নদের দুই পার্শ্বে গবর্ণমেণ্টের সুদৃঢ় বাঁধ আছে, প্রবল বন্যায় সেই বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। বন্যা-প্রপীড়িত দেশের দুর্দ্দশা দেখিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। পরদুঃখকাতর দয়াবান্ মহোদয়গণ অর্থ ও সামর্থ্য দ্বারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের প্রভূত সাহায্য করিয়া তাহাদের অনেক উপকার সাধন করিতেছেন। ভগবান্ এই সহৃদয় মহাত্মাদিগের কল্যাণ বিধান করুন।

পারস্যে গোলযোগ—পারস্যে এখনও অশান্তির বহ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই। সম্প্রতি, শুনা যাইতেছে, পারস্যের রাজ-

ধানী তিহারান নগরে বক্তিয়ারদিগের সহিত সামরিক পুলিসের দাঙ্গা হইয়া ৩০।৪০ জন লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

দিল্লীতে আয়ুর্বেদিক কলেজ—দিল্লীতে একটি আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইবার কথা হইতেছে। সিন্ধিয়ার মহারাজা প্রস্তাবিত আয়ুর্বেদিক কলেজের জন্য এককালীন ২০ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। এরূপ দান অতীব প্রশংসার্হ ও অনুকরণীয়।

ঢাকায় যাদুঘর—বঙ্গের গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল ও লেডী কারমাইকেল ঢাকা যাদুঘরের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। রাজা সীতানাথ রায় যাদুঘরের সংশ্রবে একটী পুস্তকাগার খুলিবার জন্য ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা—গত ১লা আগষ্ট মাননীয় ডিউক সাহেব বেনাভোলেণ্ট সোসাইটি সভাগৃহে পরলোকগত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের একখানি অতি সুন্দর প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বেনাভোলেণ্ট সোসাইটি রাজা বাহাদুরের এই প্রতিকৃতি সংস্থাপন করিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন।

রেঙ্গলার পরীক্ষোত্তীর্ণা মহিলা—কুমারী লোনা মেরী সোয়েন এ বৎসর কেম্বি্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেঙ্গলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। মহিলাদিগের এরূপ উন্নতি বিশেষ আনন্দের বিষয়।

শিশুজীবন ও কিণ্ডার গার্টেন।

একেলাসেঁড়েতা শিশুদিগের আর একটী সাধারণ দোষ। শিশুদিগকে সর্ব্বদা অন্যান্য ছেলেদের সহিত খেলিতে দিলে ও মাতার অপরিসীম প্রেম দ্বারা তাহাকে ভাল বাসিতে শিখাইলে শিশু আপনা আপনি সঙ্গিপ্রিয় হইবে ও ছোট ভাই বোনদিগকে স্নেহ করিতে শিখিবে। অপরিচিত লোকদিগের সম্মুখে বা পাঁচ জনের কাছে শিশুদিগকে শান্ত রাখিবার ইচ্ছা থাকিলে, তাহাদিগকে একটী স্বতন্ত্র ঘর বা বাড়ীর এক অংশ ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। সেখানে তাহারা যেন অবাধে যত ইচ্ছা লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি, খেলা ও আমোদ করিতে পায়। তাহা হইলে অন্য সময়ে ও মাতার কাছে আসিলে তাহারা সহজেই শান্ত ও স্থির থাকিবে। শিশুদিগকে দিন রাত মাতার চক্ষুর সম্মুখে রাখা উচিত নয়, তাহা হইলে তাহারা মা বিরক্ত হইবেন ভাবিয়া সর্ব্বদা যদৃচ্ছাক্রমে লাফালাফি করিতে পারে না। আর

শিশু যদি দৈবক্রমে কোন জিনিষ ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহাকে শাস্তি না দিয়া ভবিষ্যতে অধিকতর সতর্ক হইতে শিখান কর্ত্তব্য। ইহাতে বাল্যকাল হইতেই শিশুদের সাবধান ও ধীর হইবার অভ্যাস হইবে। আর যে গৃহস্থ পরিবারে শিশুদিগকে খেলার জন্য একটী স্বতন্ত্র ঘর দিবার সুবিধা নাই, তাঁহারা তাহাদিগকে সকালে বিকালে উঠানে বা ঘেরা ছাদের উপর ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু বাড়ীর নিকট কোনও শিশুবিদ্যালয় থাকিলে তাহাদিগকে তথায় পাঠাইতে অগ্রাহ্য করিবেন না। কারণ শিশুবিদ্যালয়ে তাহারা অনেক বাল্যসঙ্গী ও খেলিবার স্থান পাইয়া দ্বিগুণ আনন্দিত হইবে। শিশুদিগের সকল দুষ্টামি থামাইবার প্রধান ঔষধ তাহাদিগকে অবাধে খেলিতে দেওয়া। উহার অভাব হইলেই তাহারা অতিরিক্ত দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে, জিনিষ ভাঙ্গে ও মারামারি করে। সেই নিমিত্ত শিশুর কার্য্যকরী শক্তিকে কোন না কোন কাজে বা ক্রীড়ায় সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখা উচিত। মাটীর ঘর প্রস্তুত করা, কাণামাছি বা লুকাচুরি খেলা, দৌড়াদৌড়, লাফালাফি প্রভৃতি যে কোন নিয়োগে তাহাদিগকে ব্যস্ত রাখিবেন। তাহা হইলে শিশু আগ্রহ ও আনন্দের সহিত তাহাতে মনোনিবেশ করিবে। ক্রীড়া শিশুশক্তিবিকাশের স্বাভাবিক পথস্বরূপ। ঐ স্বভাবে যে কত সৃজননৈপুণ্য ও নির্ম্মাণচাতুর্য্য লুকান থাকে, তাহা বলা যায় না। সেইজন্য অবাধে ক্রীড়া হইতেই তাহাদের ঐ দুই বৃত্তি পুষ্টি ও বিকাশ প্রাপ্ত হয়। আমরা যদি মনোযোগ দিয়া দিন কতক শিশুদিগের ক্রীড়া আলোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে উহাতে তাহাদের বুদ্ধি ও চাতুর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হই। কোমল শিশুর ঐরূপ অযত্নের খেলাতে আমরা ভাবষ্যৎ মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি ও কার্য্যকারী শক্তির পরিচয় পাই।

আনন্দভূমির মধ্যেই ক্রীড়ারত শিশু সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু উহা কেবল আমোদের সঙ্গে মিশ্রিত হইবার আবশ্যক নাই। যে খেলায় যত শরীর সঞ্চালনের প্রয়োজন, তাহা শিশুদিগকে তত প্রফুল্ল রাখিবে। আমোদ অর্থে চোক, কাণ বা স্বাদের দ্বারা অনুভূত যত আনন্দ তাহা বুঝায়। ক্রীড়ার সামগ্রী দর্শনে শিশু প্রথম আমোদ পায়, উহার ব্যবহারের দ্বারা সে প্রফুল্ল হয়। কেবল আমোদ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় শিশুর পক্ষেও অত্যন্ত অপকারী। সর্ব্ব শরীরের চালনা হইলেই শিশু প্রফুল্ল ও সুখী হয়। শিশুদিগের সাধারণ ক্রীড়া, বড় লোকদের মত অন্য ভাবে কার্য্যশক্তির প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

অচেতন দ্রব্য লইয়াই শিশুদিগের খেলা করা উচিত, ইহা যেন কোন মা ভুলিয়া না যান, কেননা তাহারা চেতন অচেতন পদার্থের বিভিন্নতা জানে না। খোকা যেমন তাহার মার কাছে একটী ক্ষুদ্র মানুষ, পুতুল সেইরূপ

শিশুর কাছে তাহার জীবন্ত সন্তানের মত। শিশুদের কাছে প্রত্যেক বিষয় সত্যপূর্ণ। পশুরা কেবল শরীর নাড়িয়া খেলা করে, কিন্তু শিশুদের মন শরীরের সঙ্গে চলে। তাহারা চারিদিকে জীবন্ত লোক ও পশু পাখীই দেখে, সেই জন্য মৃত বা নির্জ্জীব দ্রব্যের অর্থ বুঝিতে অপারক। তাহারা চারিদিকের সকল দ্রব্যকেই জীবন্ত ভাবিয়া উহার সঙ্গে সেই ভাবে খেলা করে। সেই নিমিত্ত অচেতন দ্রব্য দিয়া সর্ব্বদা তাহাদিগকে খেলায় নিযুক্ত রাখিবে।

(ক্রমশঃ)

জন্ম মৃত্যু তত্ত্ব।

ভৌতিক জগৎ।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থ লইয়া এই অনন্ত ভৌতিক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এই বিশাল ভৌতিক রাজ্য কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের কোটী কোটী স্থানে কোটী কোটী ভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে, ধরণীর অধঃ উর্দ্ধ ও মধ্যে ইহার অন্ত নাই। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে এই জগতের পরিধি সীমাশূন্য, আমরা অবিরত যে যে বস্তু এই স্থূল চক্ষুতে অনুভব করি, সেই সকল দৃশ্যমান সৃষ্ট পদার্থ সূক্ষ্ম হইতে স্থূল রূপে পরিণত হইতেছে ও কালের অনন্ত স্রোতের সহিত নিত্য নিয়মিত পরিবর্ত্তিত রূপান্তরে গৃহীত ও নানা ভাবে নীত হইতেছে। এই অনন্ত ভৌতিক জগতের দৃশ্য অনন্ত, গতি অনন্ত, রূপ ও ভাবান্তর অনন্ত, ক্রিয়া অনন্ত, সামান্য মানববুদ্ধি উহার নিকট পরাস্ত হয়। এই জন্যই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংসশীল, পরিবর্ত্তনশীল ও প্রলয় প্রভাবে পরিব্যাপ্ত।

সনাতন ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি, সৃষ্ট বস্তু সকল মনের দ্বারা আয়ত্ত ও ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়, জ্ঞান উহার সংযোগে কার্য্য করিয়া সৃষ্টির অধীনে সৃষ্টি করিয়া থাকে। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা সকল বিশ্বজ্ঞানের পরিচালক। কাল এই সৃষ্ট মার্গকে বিবিধভাবে ও বিবিধরূপে আপনার অধীন বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা যোগে বিভাগ করিতেছে, কিন্তু কুম্ভকারের চক্রের মধ্য দণ্ডের ন্যায় অনিবার নিজ শক্তিকে নিশ্চল রাখিয়াছে।

আমরা চন্দ্র সূর্য্যের গতি দ্বারা কালের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ স্থির করিয়া আপনারা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত ও পরিসমাপ্তি প্রাপ্ত হইতেছি, মহান্ ঘূর্ণায়মান কালচক্র ভীষণ প্রভাবে এই অনন্ত ভৌতিক বিশ্ব লইয়া ঘূর্ণিত হইতেছে, ভূত সকল তদীয় বিশাল শক্তির সংঘর্ষণে নিত্য পেষিত, নিত্য নূতন সৃষ্টির অধীন হইতেছে।

এই ব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর জঙ্গম জীবের

সেই মাত্রেই ভৌতিক পরমাণুর অধীন, বিশাল কালস্রোতে প্রবাহিত, পেষিত ও নিত্য রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। এই রূপান্তরের নামই মৃত্যু বা বিলয়। অনন্ত চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি হইতে নিত্য নিত্য নব নব শক্তির উৎপত্তি ও পরস্পর আকর্ষণ বিকর্ষণ হইতেছে। প্রবল প্রবলকে, দুর্ব্বল দুর্ব্বলকে, যে যেমন শক্তি ও গুণের অধীন তাহাকে সেই সেই প্রভাবে পরিচালিত ও আবর্দ্ধিত হইতে হইতেছে, ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে ও বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্রে নীত ও নিত্য পরিচালিত হইতেছে। ভূত জগতে নিত্য ত্যাগ বিয়োগ বা প্রভেদ ও সংযোগ শক্তির অধীনে কার্য্য চলিতেছে। এই সকল শক্তিতে অনন্ত কর্ম্ম-শক্তি জীবশক্তি লইয়া উৎপন্ন হইতেছে, কিন্তু সকল জীবের প্রাধান্য অতি সামান্য। ঐ সকল জীব যোনি ও যন্ত্রণার অধীন, জরা মৃত্যুর অধীন, রোগ শোক দুঃখের অধীন। উহারা পরমশক্তিকে আশ্রয় করিতে অক্ষম বলিয়াই ঐ সকল দুঃখের অধীন, নতুবা জীবজগৎ ভৌতিক জগতকে নিজ সামর্থ্য দ্বারা পরিচালিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হয়। জীবের অসীম ক্ষমতা ভূতকে পরাস্ত করিতে পারে কিন্তু ভূতের অধীন জীবের তুচ্ছ প্রাণে তাহার সংঘর্ষণ হয় না। বা তাহা আয়ত্ত করিতে জীবের অপর মহৎ কর্ম্মবল আবশ্যক। মনের বল হইতে কর্ম্ম হয় ও কর্ম্মের অধীন সৃষ্টি। কিন্তু সৃষ্ট বস্তু আবার সেই মনকে নষ্ট করিতে প্রয়াস পায়। এ কারণ জীবকে কোন প্রকার কর্ম্মাতীত শক্তি সঞ্চয়ের মার্গ অনুসরণ করিতে হয়। মনের ঊর্দ্ধ ও অধঃ দুইটী বিভাগ আছে, কিন্তু অধোবিভাগে স্থূলে আসিয়া কার্য্য ভৌতিক শক্তির অধীন হইলেন। আর ঊর্দ্ধে গিয়া সূক্ষ্মে অর্থাৎ ক্রমশঃ পরমাত্মায় যুক্ত হইলেই তিনি তদন্তর্গত অপরীসীম অচিন্তনীয় জন্ম মৃত্যু যন্ত্রণাহীন শক্তীর অধীন হইলেন। এই ঊর্দ্ধ-শক্তি-সমন্বিত মনের অসাধ্য কিছুই নাই। তিনি ভৌতিক জগতের রাজা এবং প্রলয়কালে অজেয়, অমর বা অচল ভাবে থাকেন। চিরচাঞ্চল্যময় ভৌতিক জগতের সৃষ্টি বা সঞ্চয়ের বিরাম নাই। কোন ভূতের সংযোগে কি হইতেছে, কি যাইতেছে, উহাতে চিন্তার আবশ্যক নাই। উহা সাধারণ চক্ষুতে মানব-জ্ঞানে অনুভূতও হইবার যোগ্য নহে। ভূতের পরিবর্ত্তন ও আবাহন নিত্য বিকারযুক্ত, নিত্য পুরাতন ও নূতনের অধীন, কিন্তু রূপান্তর ব্যতীত উহার ধ্বংস হয় না, উহা নিজ নিজ জন্মস্থানকে আশ্রয় করে মাত্র, মুহুর্মুহু আশ্রিতভাবাপন্ন হইয়া আত্মাবস্থাকে চঞ্চল বিকারে যুক্ত করে। জীব সকল বিষয় সংশ্রবে বা ইন্দ্রিয় কর্ম্মাধীন হইয়া উহার স্থূল সূক্ষ্মের অধীন হয়।

বীজ হইতে বীজের উৎপত্তি ও বীজ দ্বারা বীজের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। বীজ যে গুণাক্রান্ত হয়, রূপ ও প্রভাবকে তদধীন করিয়া লইয়া থাকে। সময় তাহাকে

অন্যান্য শক্তির সাহায্যে পোষণ করে, এবং বিকারে যুক্ত হইলে পুনর্ব্বার ধ্বংস করায়। জীব সকল স্ব স্ব গুণ বা কর্ম্ম প্রভাবে সূক্ষ্মাকাশ হইতে বীজাণু সকলকে আশ্রয় করিয়া থাকে। দৃশ্যমান বস্তু মাত্রেই জীবের আবাস ও কর্ম্মভূমি। জীব পঞ্চভূতেই পঞ্চ অবস্থা লইয়া বিচরণ করিতেছে, আবার তাহা হইতে পুনঃ দৃশ্যমান জড় দেহ লাভ করিতেছে। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে বায়ুমণ্ডলে জীব সকল নিত্য অবস্থিতি করিতেছে, আমরা তাহা নিঃশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিতেছি, আমরা বায়ু ও জলস্থিত জীব সকল দ্বারা দেহস্থ জীবকে পোষণ করিতেছি, ও বীর্য্য অনুযোগে অন্য জীবের উৎপাদন করিতেছি। আমাদিগের সর্ব্ববিষয়াত্মক মন উহার পরিচালন করিয়া নিজ নিজ দৈবিক গুণ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া কর্ম্মানুযায়ী সৃষ্টির সাহায্য করিতেছে, ও ভৌতিক জগতকে পরিপুষ্ট করিতেছে। জীব যেমন জীবের উৎপাদন করে, সেইরূপ ভৌতিক দেহকে নষ্ট করিয়া থাকে। আমরা সময়ের অধীন জীবাণু সকলকে নিজ ইচ্ছামত পরিপাক করিতে পারি না। বাহ্যিক ও মানসিক জীব পরিপাকের ত্রুটি হইলেই আমরা বিকৃত ও বিনাশ প্রাপ্ত হই।

আমরা কুলপরম্পরাগত দেহ ও মনের মধ্যে জীবশক্তিকে পোষণ করিয়া থাকি। আমাদিগের বিশুদ্ধ জ্ঞপ্রবাহ আভ্যন্তরিক জীবপ্রবাহকে সতেজ করে, একারণ সূক্ষ্ম পিতৃলোক আমাদিগেরই অধীন এবং আমরাই তাহাদিগের প্রীতি বা বর্দ্ধনের জন্য শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিয়া থাকি, অর্থাৎ আমরাই আমাদিগের শ্রাদ্ধ করি।

আমাদিগের আভ্যন্তরিক ভৌতিক প্রভাব অতি অসামান্য, উহা দ্বারা ক্রমশঃ আমরা পরমাত্মবল লাভে সমর্থ হই। উক্ত বল প্রাপ্ত হইলে ভৌতিক জগতে আমাদিগের একাধিপত্য হয়।

(ক্রমশঃ)

অবলা।

ডলহৌসী পর্ব্বতের প্রান্তস্থিত কোন এক হোটেলের প্রকোষ্ঠে দাঁড়াইয়া মিস্ ঘোষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতেছিলেন। কয়েক দিন উপর্য্যুপরি বৃষ্টির পর আজ আকাশ কতকটা পরিষ্কার হইয়াছে। মেঘাবৃত আকাশের অভ্যন্তর হইতে অস্পষ্ট রবিকর ক্ষীণ রশ্মি বিতরণ করিতেছিল। অদূরে তুষার-শুভ্র পর্ব্বত-শিখরমালা রবিকিরণে রঞ্জিত হইয়া বিবিধ বর্ণ বিকীর্ণ করিতেছিল। নিম্নে, সান্নুদেশে সুদীর্ঘ সদ্য-স্নাত বিটপিশ্রেণী সুবর্ণবর্ণের কিরণমালায় রঞ্জিত হইয়া

উল্লাসে গ্রীবা আন্দোলন করিতেছে। বালা মুগ্ধ হইয়া বলিল, কি সুন্দর! ভাষায় এ সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করা যায় না।”

তাঁহার পার্শ্বস্থিত পুরুষটী সম্মতি-সূচক গ্রীবা আন্দোলন করিলেন। পুরুষটী কিন্তু বাহিরের সৌন্দর্য্য বড় দেখিতেছিলেন না, অনিমেষ নয়নে যুবতীর সেই অর্দ্ধস্ফুট রূপ-রাশি অবলোকন করিতেছিলেন। রমণীর সুকোমল রঞ্জিত গণ্ডস্থল, সুনীল বিস্ফারিত আঁখিতারা রবিকরচুম্বনে তখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পুরুষটী একান্ত চিত্তে সেই সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতেছিলেন।

“ঐ যে পাহাড়টী দেখা যা'চ্ছে—ঐ যে যাহার চূড়া পশ্চিমে হেলিয়া আছে—ও পাহাড়টার নাম কি?”

“পাহাড়টার নাম “হেলিসিয়াম্ হিল্”। আর ঐ চূড়াকে ডেন্জ্যারস্ (Dangerous) পয়েণ্ট বলে।”

“বটে! আজ আমি ও লতিকা ঐ পাহাড়ের উপর উঠিব মনে করিতেছি। কি সুন্দর!”

পর্ব্বতের উপর উঠিবেন, না পর্ব্বতের চূড়ার উপর?” তাচ্ছিল্য-ভাবে রমণী বলিলেন, “পাহাড়টা ত এখান থেকে কাছেই—আমরা চূড়ার উপরই উঠিব।”

“মাপ করিবেন, আমার বড় ইচ্ছা ছিল যে, আপনাকে এক দিন ঐ চূড়ার উপর লইয়া যাই। কিন্তু ডেন্জ্যারস্ পয়েণ্টে উঠা বড়ই কষ্টকর। এ পর্য্যন্ত কোন রমণী সেখানে উঠেন নাই ও উঠিতে পারেন নাই।”

গর্ব্বে অবলা ফুলিয়া উঠিলেন। ঘৃণা-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, “আপনি আমাকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন? আপনার দয়া বলিতে হইবে! কিন্তু আপনাকে ধন্যবাদ, আমাদের পা আছে। আমরা আপনারাইউঠিতে পারিব।”

মিস্ ঘোষের পিতামাতা কন্যার নাম “অবলা” রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে, কালে বালিকা তাঁহাদের দত্ত নাম একেবারে ব্যর্থ করিবে। রমণীগণ যে অবলা দুর্ব্বলা নহেন, তাঁহাদেরও যে বল শক্তি আছে, তাঁহারা পুরুষের অপেক্ষা যে কোন অংশেই হীন নহেন—ইহাই সপ্রমাণ করিতে রমণী তাঁহার সমগ্র জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত কথোপকথনে পাঠকপাঠিকাগণ ইহার কতকটা আভাস পাইয়া থাকিবেন।

রমণীর ব্যঙ্গ শুনিয়া পুরুষটী মৃদু হাস্য করিলেন। কহিলেন, “কিন্তু আমার ভয় হয়—”

বেচারা বাক্য সমাপ্ত করিতে পারিল না। উত্তেজিত হইয়া অবলা বলিলেন, “আপনি কি মনে করেন, আমরা উঠিতে পারিব না? যদি পুরুষেরা সেখানে উঠিতে পারে, তবে আমরাই বা পারিব না কেন? আপনি কি মেয়েদের এতই তুচ্ছ হেয় মনে করেন? আজ আপনাকে দেখাইব যে মেয়েরা পুরুষদের সমকক্ষ।”

পুরুষটী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, “না, তা নয়। পাহাড়ে উঠা আপনাদের অভ্যাস না থাকিতে পারে। অভ্যাস না

থাকিলে বৃহৎ তুষারেহ পর্ব্বতে উঠা অসম্ভব।"

"দেখিবেন অসম্ভবকেও আমরা আজ সম্ভব করিব। আচ্ছা, পাহাড়ে উঠিতে আমাদের দড়ির আবশ্যক হইবে কি না আপনি বলিতে পারেন কি?"

মিষ্টার করের হাসি আসিল। হাসা সম্বরণ করিয়া তিনি অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "দড়ী না লইয়া চূড়ার উপর উঠা কোন মতেই সম্ভব নয়।"

"ধন্যবাদ, আমরা কুলীর নিকট মোটা দড়ী চাহিয়া লইব।" "আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে আমি দড়ী আনিয়া দিই।" এই বলিয়া মিষ্টার কর তাঁহার কক্ষ হইতে এক গাছা মোটা শক্ত দড়ী আনিয়া দিলেন।

"আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ। বৈকালে বোধ হয় আমরা আরও এক জায়গায় বেড়াইতে যাইতে পারিব। আপনি এখানকার সুপরিচিত। আপনি আমাদের আর একটা সুদৃশ্য পর্ব্বত দেখাইয়া দিবেন।" তৎপরে ঈষৎ হাসিয়া রমণী কহিল, "নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার সাহায্য না লইয়াই আজ আমরা ডেনজ্যারস্ পয়েণ্টে উঠিব।"

(২)

ব্রেকফাষ্ট্ ভোজনের পর দুইজন রমণী পর্ব্বতারোহণার্থ চলিয়া গেলেন। মিষ্টার কর চুরুট খাইতে খাইতে সুখন সিংএর সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। সুখন সিং পাঞ্জাবী, হোটেলের ম্যানেজারের পুত্র। মিষ্টার কর এ হোটেলে অনেক দিন আছেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল।

সুখন সিং হাসিয়া বলিলেন, "কি কর সাহেব। আপনি যে মেয়েদের সঙ্গে গেলেন না? ব্যাপার কি?" "সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না। তাঁদের সঙ্গ উপভোগ করা কি আমার অদৃষ্টে আছে?"

"তবে বসে কি করিবেন চলুন, বেড়াইয়া আসি। আজ এভ্যানচেলে উঠিবেন।"

কর সাহেব ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। "চলুন তবে, ডেনজ্যারস্ পয়েণ্টের আর একটা পথ আজ আমরা আবিষ্কার করিয়া আসি।"

"সে পথ বন্ধ। ডেনজ্যারস্ পয়েণ্টে আজ আর এক পার্টি উঠছেন।"

বিস্মিত হইয়া সুকন সিং বলিলেন, "বলেন কি? অসম্ভব। আপনি ছাড়া আর কোন বাঙ্গালী যে এ পাহাড়ে উঠিতে পারিবে তাহা আমার ধারণা ছিল না। চলুন তবে, আমরা তাঁদের গতিবিধি লক্ষ্য করি!"

"আমারও তাই ইচ্ছা। কিন্তু তাঁদের ওঠা দেখ্তে সাহস হয় না। তাঁরা পুরুষ নন, তাঁরা রমণী। আজ মিস্ অবলা ঘোষ, ও মিস্ লীলি রায় ডেনজ্যারস্ পয়েণ্টে উঠ্তেছেন।"

সুখন সিং স্তম্ভিত হইয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কি? আপনি সুদক্ষ পাহাড়ী, পর্ব্বতারোহণে অভ্যস্ত! আপনি

দুইটী নির্ব্বোধ অজ্ঞ রমণীকে ডেনজারস্ পয়েণ্টে উঠ্‌তে অনুমতি দিলেন ?"

"অনুমতি ? তাঁরা কি আমার অনুমতির অপেক্ষা করেন ? বরং আমি যদি তাঁদের বাধা দিতাম, তবে তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত উঠ্‌তেন। তুমি তাঁদের মতামত জান না। তাঁরা পুরুষের সমকক্ষ হ'তে চান। চল—আমরা লুকিয়ে তাঁদের গতিবিধি দেখি গে। তাঁদের যদি কোন বিপদ হয়, আমরা সাহায্য কর্‌তে পারব।"

"তাই চলুন। আমরা টাইগার ক্লু'র অন্তরাল হইতে তাঁদের লক্ষ্য করব।" দুর্ব্বিন লইয়া তাঁহারা উভয়ে চলিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে মিস্ রায় পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলেন। মিস্ রায় মধ্যবয়সী ও বিশালাঙ্গী, সুতরাং কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। সম্মুখে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমাদের ভুল হইয়া থাকিবে, এ ধারে উঠিবার কোন পথ ত দেখিতেছি না। বিড়াল ছাড়া অন্য কোন প্রাণী এ ধার দিয়া পাহাড়ে উঠিতে পারে না।"

গ্রীবা আন্দোলন করিয়া মিস্ ঘোষ উত্তর করিলেন, "না,—দেখ্‌ছ না—ওধারটা কি রকম ঝুলে পড়েছে ? এ ধার দিয়েই উঠ্‌তে হবে।"

এই বলিয়া ক্ষুদ্র বৃক্ষাবলীর উপর ভর দিয়া মিস্ ঘোষ সেই বিশাল উচ্চ প্রস্তর অতিক্রম করিয়া গেলেন। মিস্ রায়কে অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশেষ বিরক্ত হইয়া অবলার পশ্চাদ্ধাবন করিতে হইল। কিন্তু তাঁহার স্থূল বপুঃ অত্যধিক পরিশ্রমে দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল।

অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তাঁহারা পুনরায় সেই সমুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণ করিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধেক পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময় পুনরায় লতা-গুল্মহীন মসৃণ প্রস্তর তাঁহাদের গতিরোধ করিল। মিস্ রায় শ্রান্ত হইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিয়া উঠিলেন, "অসম্ভব—এটাকে অতিক্রম করা কোন মতেই সম্ভব নয়।" হতাশ হইয়া তিনি সেই প্রস্তরের উপর বসিয়া পড়িলেন। এবার মিনতি করিয়া তিনি বলিলেন, "অবলা, আর কাজ নাই, ফিরিয়া চল। দেখ, এরই মধ্যে ২টা বেজে গেছে। চূড়ায় উঠা অসম্ভব। লাঞ্চের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। চল, ফিরে যাই।"

স্থিরপ্রতিজ্ঞ মিস্ ঘোষ বলিলেন, "সে কোন মতেই হ'তে পারে না। মিষ্টার কর যে আমাদের বিদ্রূপ কর্‌বেন, সে আমি প্রাণ থাকিতে সহ্য কর্‌তে পারব না। হতাশ হ'চ্ছ কেন ? পাথরের মাঝে মাঝে খাঁজ আছে, দেখ্‌ছ না ? খাঁজে পা দি'য়ে বেশ ওঠা যাবে। আমি উপরে উঠিয়া না হয় তোমার জন্য দড়ি ফেলে দিচ্ছি। তুমি দড়ি ধ'রে উঠে আস্‌তে পারবে।"

প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া অবলা অনায়াসেই সেই বৃহৎ শিলাখণ্ড লঙ্ঘন

করিয়া গেলেন। তিনি প্রস্তরের অপর প্রান্ত হইতে মিস্ রায়ের জন্য রজ্জু নিক্ষেপ করিয়া দিয়া তাঁহাকে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

কিন্তু এবার তাঁহার সব অনুরোধ বৃথা হইল। মিস্ রায় সেই বন্ধুর দুরারোহ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে কোন মতেই স্বীকৃত হইলেন না। তিনি কাতর ভাবে কহিলেন, "আর পারি না ভাই। আমার পক্ষে আর ওঠা অসম্ভব। তুমি নেমে এস। আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে। ল'ঞ্চের সময় কখন হয়ে গে'ছে।"

মিস্ ঘোষ রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "আত্ম-সম্মান অপেক্ষা যদি ল'ঞ্চ তোমার অধিক ভাল লাগে, তবে তুমি ল'ঞ্চ খাও গে। আমি যাইব না।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া মিস্ ঘোষ পুনরায় পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। ভগিনী নিবেদিতার মেমোরিয়্যাল ফণ্ডে ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

২। মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ্ণৌ নগরে মোসলেম্ ইউনিভার্সিটি ফাউণ্ডেশন কমিটির এক অধিবেশন হইবে।

৩। করাচীর একজন অধিবাসী তিনটী বালিকাকে ভাওয়ালপুর রাজ্যে বিক্রয় করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। বালিকা তিনটির বয়স এত অল্প যে, তাহারা সাক্ষ্য দিতে পারে নাই।

৪। দরিদ্র বালকগণ যাহাতে পুস্তক, শ্লেট, কালি, কলম প্রভৃতি কিনিতে পারে তজ্জন্য মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ৬০০০৲ ছয় সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

৪। শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী পঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধরে "কন্যা মহাবিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পঞ্জাবের ছোট লাট বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া প্রীত হইয়া বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

আগামী ২১শে ভাদ্র মাণিকতলা ষ্ট্রীটস্থ মনোরমা কাণ্ডেল ফ্যাক্টরীতে মহিলা শিল্প প্রদর্শনীর কার্য্য আরম্ভ হইবে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন।

৭। আগামী কংগ্রেসে মান্দ্রাজের সৈয়দ মহম্মদ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

৮। বিগত ১৫ই আগষ্ট হইতে পার্লেমেণ্টের অধিবেশন বন্ধ হইয়াছে।

সমালোচনা।

আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি।

গৃহিণীর কর্ত্তব্য—শ্রীআনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত একখানি পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্মের শিক্ষোপযোগী উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ। এবার ইহার ষষ্ঠ সংস্করণ। ইহাতে গৃহিণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দশটী সরল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা আশা করি, এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে বঙ্গীয় নারীগণ সুমাতা ও সুগৃহিণী হইয়া সংসারের কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হইতে পারিবেন। গ্রন্থকার বিবিধ শাস্ত্র হইতে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া ও কয়েকটি দৃষ্টান্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া রমণীগণের হৃদয়ে কর্ত্তব্যগুলি মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। প্রত্যেক বঙ্গীয় গৃহিণীকে আমরা ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আনন্দ বাবু এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বঙ্গের গৃহিণীগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

আদর্শ-লিপিমালা—আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত, মূল্য ১৲। ইহাতে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির পত্র উদ্ধৃত করিয়া পত্র লিখিবার আদর্শ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। পরে ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ব্যবসা ও বাণিজ্য—নূতন ধরণের সচিত্র মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০। 'ব্যবসা বাণিজ্য' বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে একটী সম্পূর্ণ নূতন ধরণের মাসিক। দেশে ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রচার করা ইহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অতি মহৎ। 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' কেবল শুষ্ক ব্যবসা বাণিজ্যের কথাতেই নিজ অঙ্গ পূর্ণ করেন নাই, ইহাতে হাস্যরসেরও আস্বাদ আছে। আমরা ইহা পাঠে যার পর নাই প্রীত হইয়াছি। ভগবান্ ইহার উদ্দেশ্য সফল করিয়া পত্রখানি দীর্ঘজীবী করুন।

ছাত্র-সুহৃদ্—ঢাকার কালীগঞ্জস্থ রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ হাই স্কুলের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত একখানি মাসিক পত্র, বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা।

ছাত্রবর্গের এ উদ্যম মন্দ নয়। কালে ইহারা সুলেখক হইতে পারিবে আশা করা যায়।

প্রীতি—সচিত্র মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছাত্রগণের জন্য ১৷০ টাকা ও সাধারণের জন্য ২৲ টাকা।

প্রীতির এবার তৃতীয় বর্ষ। ইহাতে অনেকগুলি সুন্দর বিলাতী ও দেশী ছবি আছে। প্রবন্ধাদি মন্দ নয়।

সুধী—মাসিক পত্র, প্রথম বর্ষ, শ্রীকালবরণ ঘোষ সম্পাদিত, মূল্য ২৷০ টাকা। চিত্রগুলি অতি সুন্দর। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

শিশু—ছেলেদের সচিত্র মাসিক পত্র, মূল্য ১৲ এক টাকা।

'শিশু' শিশুরাজ্যের অতুল সম্পদ। ছেলেদের পাঠের উপযুক্ত এরূপ সরল সুন্দর মাসিক পত্র বাঙ্গালায় অতি অল্প। শিশু পাঠে ছেলেরা আহার নিদ্রা ভুলিয়া যায়। শিশু কেবল শিশুদিগের আদরের সামগ্রী নহে, বৃদ্ধেরাও ইহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন না। শিশু এইরূপ শিশুরাজ্যের মনোহারী হইয়া আপনার উদ্দেশ্য সাধন করুন, এই আমাদের ইচ্ছা।

বামারচনা।

নিবেদন।

১

কলুষিত চিত্ত মম মুছায়ে দাও
ওগো অগতির গতি,
তোমারি বিশাল বক্ষেতে আমারে
ঠাঁই দাও প্রাণপতি।

২

যেথায় থেকে থেকে জীবন আমার
হয়ে গেছে পাপময়,
কেমনে তরিব যে ভীষণ নরক
হয়েছে গো সেই ভয়।

৩

উদ্ধার নাথ উদ্ধার আমায় তুমি
ভীষণ নরক হতে,
ভুলায়ে সংসারের হিংসা, দ্বেষ, লিপ্সা,
নিয়ে চল গো স্বপথে।

৪

উদ্ধারিয়ে জগতে রেখ না আর,
রাখিও তোমারি পদে,
দাসী ভেবে সেবিতে রাখিও আর
চরণ রাখিও হৃদে।

'চলিতে দাও'।

ওগো দেবতা আমার!
তুমি—সফল করেছ
বিফল জীবন,
পবিত্র প্রেম পরশে তব,
তুচ্ছ এ জীবন,
উচ্চ করে দেছ,
দিয়ে সুখ অভিনব।
তুমি সফল করেছ
বিফল জীবন
পবিত্র প্রেম পরশে তব॥ ১
ওগো সুহৃৎ আমার,
নীরব এ বীণা
সরব করেছ
মধুর প্রেমের ঝঙ্কারে,

মরুভূ হৃদয়
সিক্ত করে দেছ
ঢালিয়া মধুর প্রেমধারে
তুমি　সরব করেছ
নীরব এ বীণা
মধুর প্রেমের ঝঙ্কারে ॥ ২

ওগো শক্তি আমার!
তুমি চিনায়েছ
অনন্তের পথ
ধ্যান-ধারণা সকলি তুমি
তোমারই প্রেমে
যে প্রেম শিখেছি
সে প্রেমে ডুবিতে চাহি গো আমি।
মোরে—তুমি চিনায়েছ
অনন্তের পথ
ধ্যান ধারণা সকলি তুমি ॥ ৩

ওগো প্রাণেশ আমার!
শিক্ষা-গুরু হয়ে
শিখাও আমারে
তুমি অনন্তের সাথেতে যোগ।
সংসারের চিন্তা
ভুলে যাই আমি
হৃদে ধরে সেই নবীন আলোক
শিক্ষা-গুরু হয়ে
শিখাও আমারে
তুমি　অনন্তের সাথেতে যোগ ॥ ৪

ওগো দেবতা আমার!
পরাণের সাধ
যে টুকু মিটেছে
এর বেশী নহে মিটিবার,

তাই—সকল ভুলে
মহা প্রেমে ডুবে
রহিতে চাই গো অনিবার।
হৃদয়ের সাধ
যে টুকু মিটেছে
এর বেশী নহে মিটিবার ॥ ৫

ওগো শক্তি আমার!
বাধা দিয়ে তুমি
ফিরায়োনা মোরে,
অনন্তের পথে চলিতে দাও।
বাকী যাহা র'ল
হবে পর-পারে
অভাগার কথা ভুলিয়া যাও!
তুমি—বাধা দিয়ে মোরে
ফিরায়ো না আর
অনন্তের পথে চলিতে দাও। ৬

ওগো সখা আমার!
সেথা মন দিলে
অনিত্যের তরে
হয় না করিতে হাহাকার।
ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ
তুচ্ছ করিয়া
পাইতে চাই গো সারাৎসার।
সেথা মন দিলে
হয় না করিতে
অনিত্যের তরে হাহাকার। ৭

ওগো প্রভু আমার!
ভুলিয়া অনিত্য,
একমাত্র 'সত্য'
হৃদয়ের মাঝে ধরিতে চাই।

বিড়ম্বনাময়
জীবনেতে মোর
দেখি যদি কিছু শান্তি পাই।
বিশ্বেশ্বর প্রেম
ভুলিয়া অনিত্য
একমাত্র 'সত্য'
হৃদয়ের মাঝে ধরিতে চাই। ৮

আরাধ্য আমার!
আকাঙ্ক্ষিত যাহা,
ছিল মোর হেথা,
না পেনু তাহা মরু ধরায়।
ও পারে পাবার,
আশাতে গো তাই,
চাহি গো বসিতে সাধনায়।
আকাঙ্ক্ষিত যাহা
ছিল মোর হেথা
না পেনু তাহা মরু ধরায়। ৯

নয়ন দেখেনি।

নয়ন দেখেনি তারে,
শুনেছে শুধুই গান।
মৃদু মৃদু ওই সুর,
সদাই বাধিছে প্রাণ॥
সেই সুর সেই তানে
হয়ে আছি আমি ভোর।
হৃদয় বীণায় আজি
বাজিছে রাগিণী তোর॥
আধ মুকুলিত ফুল
নিদাঘের খর বায়।
ঝরে গেছে ম্লান হয়ে
আছে শুধু বাস হায়॥
লুটায়ে পড়েছে ভুমে ধীরে
বিদলিত শাখা ওই।
আলো করে ছিল যেথা
তরুণ কুসুম সেই॥
শোভাহীন হয়ে আছে
ঝটিকা-তাড়িত হয়ে।
যেন কত অপরাধী
কত অনুতাপ লয়ে॥
কে আজি নিল রে তুলে
পারিজাত মরতের।
ফুলহীন ছিল বুঝি
সে কানন ত্রিদিবের॥
তাই বুঝি ছিঁড়ে নিল
না ফুটিতে ফুলকলি।
দেবতাচরণে কেহ
হয় ত দিয়েছে ডালি॥
নিশীথের তারা সম
কভু যদি পড়ে খসে
বুক পেতে লব তুলে
গভীর আনন্দে ভেসে॥

কুমারী সুনীতি,
কেশবধাম (বেনারস)।

১৩.৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 602. October, 1913.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫১ বর্ষ। ৬০২ সংখ্যা। } আশ্বিন, ১৩২০। অক্টোবর, ১৯১৩ { ১০ম কল্প। ২য় ভাগ।

গৃহজাত শাক সবজীর বাগান।

বাসগৃহের সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে নিত্য ব্যবহার্য্য শাক সবজী রোপিত হইয়া থাকিলে তাহা দ্বারা গৃহস্থের রসনার তৃপ্তির সহিত নয়নের তৃপ্তিও কিঞ্চিৎ সাধন করিতে পারে। এই সামান্য কৃষিকার্য্যের চর্চ্চায় মনেও কিঞ্চিৎ আনন্দ এবং তৎসঙ্গে উদ্ভিদবিষয়ক জ্ঞানও কিছু লাভ হয়। এই সহজসাধ্য কার্য্যগুলি স্বহস্তে করিতে পারিলে তদ্দ্বারা যে শ্রম হয়, তাহাতে স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়।

বাজারের শুষ্ক প্রায়, বাসি কিম্বা জলনিষেক দ্বারা সপ্তাহ কাল রক্ষিত, ধূলি ও তৎসহ হয়ত নানা রোগের বীজাণুসংযুক্ত শাক সবজী অপেক্ষা বাগানের টাট্‌কা, রসযুক্ত শাক সবজী কত সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর, তাহা যাঁহারা প্রতিদিন ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই জানেন। স্বহস্তে বা নিজের তত্ত্বাবধানে উৎপাদিত গৃহজাত শাক সবজী বাজারে ক্রয় করা অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তজ্জন্য ইহাতে গৃহস্থের সাংসারিক ব্যয়েরও কিছু লাঘব হয়। ঐ সকল দ্রব্য নিজ নিজ বাটীতে উৎপাদন করিতে গৃহস্থমাত্রেরই সাধ্যানুসারে যত্ন করা উচিত।

শ্রমশীল ও সুদক্ষ গৃহস্থ বাজারের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া না থাকিয়া, তাঁহার গৃহের চতুর্দ্দিকে প্রতিদিন বাজার সজ্জিত করিতে পারেন। কোন বৃদ্ধ মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন "বাপু, বাড়ীতে নিত্য হাট বাজার বসাইবে।" এই হাট বাজারের অর্থ বাসগৃহের চতুর্দ্দিকে শাক সবজীর ক্ষেত্র করিয়া ঐ সকল

উৎপাদন করা। এদেশে নিতান্ত দরিদ্রেরও একখানি কুটীর আছে এবং কুটীরের চতুর্দ্দিকে কিম্বা তাহার এক প্রান্তে কিছু না কিছু ভূমিও আছে। সুতরাং প্রায় সকলে অল্প চেষ্টাতেই বাসগৃহের চতুর্দ্দিকে শাকসব্জী প্রভৃতি দৈনিক খাদ্যোপযোগী তরকারী উৎপাদন করিয়া অনায়াসে সাংসারিক ব্যয়ের কিঞ্চিৎ লাঘব করিতে পারেন।

ঋতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শাকসব্জী উৎপন্ন হয়, কোন্ সময়ে কোন্ সব্জী উৎপন্ন হয়, এবং কি প্রণালীতে চাষ করিলে যত্ন ও চেষ্টা সফল হয়, সে বিষয়ে সকলেরই কিছু জ্ঞান না থাকিলে পরিশ্রম বৃথা হইবার সম্ভাবনা। সদ্যোজাত শিশুর পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার অনভিজ্ঞ ধাত্রীর হস্তে সমর্পণ করিয়া যেমন সফলকাম হওয়া দুরাশা, উদ্ভিদ্ উৎপাদন ও পালন বিষয়ে কিছু জ্ঞান না থাকিলে প্রায় তদ্রূপই হইয়া থাকে।

উদ্ভিদগণের উৎপত্তি, পোষণ ও বৃদ্ধির জন্য মৃত্তিকা, জল, বায়ু, উত্তাপ ও আলোক, এইগুলি বিশেষ ও অপরিত্যাগ্যরূপে প্রয়োজনীয়। উদ্ভিদ্ সকল মৃত্তিকা, জল ও বায়ু হইতে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি গ্রহণ করিয়া আপনাদের জীবনরক্ষা ও পুষ্টিসাধন করে। ঐ সকল উপাদান গ্রহণ ও তাহা শরীরস্থ করিবার বিষয়ে উত্তাপ ও আলোক তাহাদের সহায়তা করে।

একই ভূমিতে একাদিক্রমে ও অবিচ্ছেদে উদ্ভিজ্জাদি উৎপাদন করিলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়, এজন্য প্রত্যেক বার বপন বা রোপণের পূর্ব্বে ভূমিতে সার সংযোগ করা একান্ত আবশ্যক। সার সংযোগে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ব্বোৎপন্ন ফসলের জন্য ভূমির যে উদ্ভিদ-পোষণের উপাদানগুলি বাধিত হইয়াছিল তাহারও পূরণ হয়। কিছু রোপণ বা বপন না করিয়া, ভূমি কিছু কাল ফেলিয়া রাখিলে উহার উর্ব্বরতার আংশিক বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপ হয় না। সর্ব্বপ্রকার মৃত্তিকা ও সার উদ্ভিদের পক্ষে সমান উপযোগী নহে। সার সংযোগে ও বালুকামিশ্রণাদি দ্বারা মৃত্তিকার অবস্থা রূপান্তরিত করিয়া তাহা উদ্ভিদ্ উৎপাদনের উপযোগী করা যাইতে পারে।

সার নানাবিধ, তন্মধ্যে গোবর, গোমূত্র ও আবর্জ্জনা, পচা পাতা, পুষ্করিণীর পাঁক, পলিমাটি, হাড়, খইল ও ক্ষুদ্র গলিত মৎস্য প্রভৃতি সহজলভ্য ও সচরাচর সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া ভাসিয়া না যায়, এইজন্য ছায়াযুক্ত স্থানে অগভীর গর্ত্তে প্রতিদিনের আবর্জ্জনা, গোবর ও বৃক্ষের গলিত পত্র প্রভৃতি পচাইয়া রাখিলে তাহা উত্তম সাররূপে পরিণত হয়, এবং ইহা ক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারা যায়। খইল প্রায় সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদের পক্ষেই উপযোগী। সর্ষপ ও তিসির খইল টাট্‌কা ব্যবহার না করিয়া, ১৫।২০ দিন রাখিয়া উহার উগ্রতা কিছু হ্রাস হইলে, চূর্ণ

করিয়া কিম্বা জলে গুলিয়া ক্ষেত্রে প্রদান করা উচিত। খইল যাহাতে মৃত্তিকার অধিক নিম্নে না যায় এইরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ভূমিতে অমিশ্র খইল না দিয়া সারমাটী, গোবরের গুঁড়া বা অন্য কোন প্রকার সারের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে ভাল হয়। ইহাতে আঁটাল ও কঠিন মৃত্তিকা কিঞ্চিৎ নরম ও শিথিল হয়। খইল মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া উত্তম রূপে না পচিলে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায় না। অন্যান্য সার অপেক্ষা খইলের মধ্যে জল ও বায়ু শীঘ্র প্রবিষ্ট হয় বলিয়া উহা শীঘ্র পচিয়া উঠে। এই কারণে এবং সহজলভ্য ও ব্যবহার করা কষ্টসাধ্য নহে বলিয়া ইহা গৃহস্থের সব্জী বাগানে ব্যবহারের একান্ত উপযোগী বলিয়া মনে হয়। ইহা ব্যতীত খইলে যে সমস্ত উদ্ভিদ্‌পোষক পদার্থ আছে, তাহা অস্থিচূর্ণ ও অন্যান্য প্রাণিজ সারের প্রায় সমতুল্য বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। সচরাচর এক কাঠা পরিমাণ ভূমিতে আড়াই সের, তিন সের খইল সংযোগ করিলেই বেশ ফল পাওয়া যায়। আঁটাল মাটীর ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক পরিমাণে দেওয়া আবশ্যক। ছাই সাররূপে ব্যবহৃত হইলে ইহাতেও কঠিন মৃত্তিকা শিথিল হয়, এবং ইহা আদা, মানকচু, পেঁপে প্রভৃতির পক্ষে বিশেষ উপকারী। মানকচু গাছের গোড়ায় ছাই যত উচ্চ করিয়া দেওয়া যায়, কচু তত বড় হইয়া থাকে।

জল প্রাণিদেহের ন্যায় উদ্ভিদেরও জীবনস্বরূপ, কিন্তু অতিরিক্ত জলসেচন দ্বারা উদ্ভিদের অনিষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল শাক সব্জীতে জলসেচন করিতে হয়, তাহা অপরাহ্ণে ও সায়াহ্নে করাই উচিত। উদ্ভিদের মূল মৃত্তিকার অভ্যন্তরে যত প্রবিষ্ট হইবে, উদ্ভিদের ততই পুষ্টি ও বৃদ্ধি হইবে। কোমল মূলগুলি সহজে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে এইজন্য ক্ষেত্র কর্ষণ বা খনন করা আবশ্যক। কর্ষিত ভূমিতে জল সহজেই শোষিত হইয়া ভূমির অভ্যন্তরভাগ সরস ও কোমল রাখে। উদ্ভিজ্জ-মূলের কোমল অংশগুলির মৃত্তিকাস্থ রস শোষণের যেমন শক্তি আছে, তেমনি উহা অনায়াসে প্রচুর রস আকর্ষণ করিতে পারে বলিয়াই উদ্ভিদ্‌ দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

কোন বীজ বপন বা চারা রোপণ করিবার অন্ততঃ দুই তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে ভূমি খনন করিয়া তৃণগুল্মাদির মূল সকল দূর ও সার সংযোগ করিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করা আবশ্যক। তৃণাদির মূল থাকিলে তাহা হইতে পুনরায় তৃণ জন্মিয়া ক্ষেত্রের রসের অপচয় করে ও তজ্জন্য শাকাদির যথোচিত বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। পরে কোমল চারাগুলির ভিতর হইতে সেই তৃণাদি বিদূরিত করাও কিছু অসুবিধাজনক হয়, আর তাহাতে অনেক চারাও নষ্ট হইয়া থাকে।

লঙ্কা, বেগুন, ডাঁটা, শাক প্রভৃতি যে সকল উদ্ভিদের চারা এক স্থান হইতে

তুলিয়া স্থানান্তরে রোপণ করিতে হয়,তাহাদিগের বীজ প্রথমে কিঞ্চিৎ ছায়াযুক্ত স্থানে হাপরে কিম্বা গামলায় সার সংযোগে মাটী প্রস্তুত করিয়া বপন করিতে হইবে। পরে চারাগুলি ৭.৮ ইঞ্চ পরিমাণ লম্বা হইলে ক্ষেত্রে রোপণ করিবার উপযোগী হইবে।

শাক সব্‌জী রোপণের জন্য ভূমি উত্তমরূপে খুঁড়িয়া মাটী সমান করিয়া তাহার উপর সার ছড়াইয়া দিতে হইবে। পরে অল্প গভীর করিয়া তাহা এরূপ ভাবে পুনর্ব্বায় খুঁড়িতে হইবে যে, মাটী সমান করিয়া দিলে ঐ সার যেন ঢাকা পড়ে। এইরূপে সার ঢাকিয়া দিলে, সত্বর অধিক বৃষ্টি হইলেও বৃষ্টির জলে সার ধৌত হইয়া ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইতে পারিবে না। পরন্তু ঐ সার জলে গলিয়া, তাহার সারাংশ ভূমির নিম্নভাগে প্রবিষ্ট হইবে এবং তাহাতে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। পরে ঐ ভূমিতে বীজ বপন বা চারা রোপণ করিলে উত্তমরূপ ফললাভ হইবে।

কপি কিম্বা তজ্জাতীয় অন্য কোন শাকের জন্য ভূমির উপর দুই ইঞ্চ পরিমাণ সারের স্তর বিস্তৃত করা উচিত। ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সার দিলে তাহাতে উপকার ব্যতীত অপকারের সম্ভাবনা নাই। শশা, কাঁকুড়, কুমড়া, ঝিঙে, ধুঁধুল, করলা, লাউ, সীম প্রভৃতির বীজ বপন করিতে হইলে, দুই কি দেড় ফিট ব্যাসবিশিষ্ট গোলাকার স্থান খুঁড়িয়া ও সার দিয়া ভূমি (মাদা) প্রস্তুত করিতে হয়। এক একটি মাদায় ৮।১০টি মাত্র বীজ দূরে দূরে বপন করিলে চারাগুলি বেশ সতেজ হয়। বীজগুলি এক ইঞ্চ পরিমাণ মাটীর নীচে বসাইয়া ঢাকিয়া দেওয়া আবশ্যক। লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতির বীজ বপন করিবার পূর্ব্বদিন ভিজাইয়া রাখিয়া বপন করিলে শীঘ্রই উহা অঙ্কুরিত হয়। এই সমস্ত লতা অল্পসংখ্যক হইলে মাচায় তুলিয়া দেওয়াই সুবিধাজনক। তজ্জন্য মাচার সান্নিধ্যে দুই একটি মাদাতে বপন করিলেই যথেষ্ট হয়। বিস্তৃত ক্ষেত্রে ভূমিতে লতাইতে দিতে হইলে ১০।১২ হাত অন্তর এক একটি মাদা করা আবশ্যক। অধিক ঘন হইলে লতাগুলি দুর্ব্বল হয় এবং ফলও অধিক হয় না। নটে শাক, পালং শাক প্রভৃতির বীজ পাতলা করিয়া বপন করিতে হয়, তাহা হইলে ঝাড়গুলি বড় বড় হইবে। পালং শাকে প্রত্যহ জল দেওয়া আবশ্যক, প্রত্যহ না দিতে পারিলেও অন্ততঃ যে দিন শাক কাটিয়া লওয়া হয়, সেইদিন ও তাহার পর দুই চারি দিন ক্ষেত্রে জল দেওয়া উচিত, নতুবা শাক শীঘ্র বাড়িতে পারে না। শাক কচি অবস্থায় সুখাদ্য, এই কারণে কন্‌কা রাঙা প্রভৃতি যে সকল শাক ক্ষেত্র হইতে উৎপাটন করিয়া লওয়া হইয়া থাকে, তাহাদের বীজ একদিনে সমুদায় বপন না করিয়া ১০।১২ দিন অন্তর তিন চারিটি ক্ষেত্রে বপন করিলে

কচি শাক পাইবার বেশ সুবিধা হয়। পালং শাক বপন করিবার পরে যতদিন অঙ্কুরিত না হয়, ততদিন দিবাভাগে ক্ষেত্র ঢাকিয়া রাখিতে হয়, নতুবা পাখীতে বীজগুলি খাইয়া যায়, আর রৌদ্রে ক্ষেত্র শুষ্ক হওয়াতে বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব ঘটে। অঙ্কুরিত হইলে ভেক ইহার এক প্রধান শত্রু। অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত অনেকগুলি কাঠি দুই তিন শ্রেণীতে ক্ষেতের মধ্যে পুতিয়া তাহার অগ্রভাগে অল্প পরিমাণে গোবর লাগাইয়া দিলে, ভেকের গ্রাস হইতে অঙ্কুরগুলিকে রক্ষা করা যায়। অনেক সময় ডাঁটা, নটেশাক ও শশা, কুমড়া, ঝিঙা প্রভৃতির চারার পাতা পোকায় খাইয়া নষ্ট করে। ঘুঁটের ছাই গুঁড়া করিয়া এই সকল শাক ও চারার পাতায় ছড়াইয়া দিলে আর পোকা ধরিতে পারে না।

চৈত্র মাসে ভূমি খনন করিয়া ও সার দিয়া প্রস্তুত করিয়া, বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হইলে নটেশাক, ডাঁটাশাক, পুঁইশাক, শশা, কুমড়া, ঝিঙে, ধুঁধুল, করোলা, সীম, বটবটি, কাঁকুড়, ঢেঁড়স প্রভৃতির বীজ বপন করিতে হয়। কলাগাছও এই সময় রোপণ করিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে এই সব চারার গোড়া পরিষ্কার করিতে হয়, আবশ্যক হইলে সার দিতে হয় এবং বেগুনের বীজ বপন করিবার জন্য হাপর প্রস্তুত ও বেগুনের বীজ বপন করিতে হয়। আদা রোপণ করিতে হইলে এই মাসে আদার অঙ্কুরযুক্ত অংশগুলি রোপণ করিতে হয়। আষাঢ় মাসে ডাঁটার চারাগুলি হাপর হইতে তুলিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়, হাপরে লঙ্কার বীজ বপন করিতে হয়, বেগুনের চারা বসাইবার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে ও আদার গোড়ায় মাটী ধরাইতে হয় এবং পেঁপের চারা ও পুদিনা শাক এই সময় রোপণ করিতে হয়। শ্রাবণ মাস বেগুনের চারাগুলি ক্ষেত্রে রোপণ ও লাউএর বীজ বপন করিবার প্রশস্ত সময়। ভাদ্র মাসে অতিরিক্ত বৃষ্টি না হইলে লঙ্কার চারা ক্ষেত্রে রোপণ, এবং কপি ও আলুর ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে ও বেগুন গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। লাউ গাছের গোড়া এই সময়ে খুঁড়িয়া সার ও আবর্জ্জনা দিয়া জল দাঁড়াইবার উপযুক্ত করিয়া দিতে হয়। শীতকালে যে সমস্ত শাক সব্জী উৎপন্ন হয়, আশ্বিন মাস তাহা রোপণ ও বপন করিবার প্রশস্ত সময়। তবে বর্ষার ন্যূনাধিক্যবশতঃ কিছু অগ্র পশ্চাৎ হইতে পারে। এই মাসে আলু, কপি, মূলা, শালগাম, বীট, গাজর, পালংশাক, টকপালং, কনকরাঙা শাক, লাউ কুমড়া প্রভৃতির বীজ বপন ও রাঙা আলুর ডগা রোপণ করিতে হয়। পুরাতন বেগুন গাছের ডাল কাটিয়া রাখিয়া দিলে তাহাকে নূতন ডাল গজাইয়া এই সময় বেগুন ফলিতে আরম্ভ করে। আশ্বিন মাসে অধিক বর্ষার জন্য যদি কোন বীজ বপন করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কার্ত্তিক মাসে জল সেচন করিয়া তাহা করিতে হইবে। ধনে, মেথি, ছোলা, মটর প্রভৃতি ও তরমুজের বীজ বপন

এবং মানকচুর চারা কিম্বা মূলের অগ্রভাগ, ওলের মুখী এই সময়ে রোপণ করিতে হয় ও লঙ্কার ক্ষেত খুঁড়িয়া দিতে হয়। অগ্রহায়ণ মাসে শাকের ক্ষেতে জল সেচন, আলু কপি তুলিয়া লওয়া ও পটলের মূলগুলি রোপণ করা ব্যতীত অধিক কোন কাজ নাই। পৌষমাসে পটলের মূলগুলি অঙ্কুরিত হইলে ক্ষেত্র খুঁড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। মাঘ মাসে মানকচু ও ওলের গোড়ায় প্রচুর ছাই ও আবর্জ্জনা দিতে হয়। ফাল্গুন মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত কলাগাছ রোপণ করিবার প্রশস্ত সময়। চৈত্রমাসে সব্জীর বাগান প্রায় শূন্য হইয়া যায়। যদি প্রত্যহ প্রচুর জল সেচন করা যায় তাহা হইলে নটেশাকের বীজ এই সময় বপন করা যাইতে পারে। বেগুন গাছের ডাল এই সময় কাটিয়া দিয়া সমস্ত বাগান খুঁড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। বৈশাখ মাসে বীজ বপনের উপযুক্ত করিয়া চৈত্র মাসে ভূমি খনন করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। এই মাসে বৃষ্টি হইলেই বৈশাখের বপনীয় ও রোপণীয় সকল শস্য বপন ও রোপণ করা যাইতে পারে।

এই নিয়মে শাক সব্জীর বাগান করিতে পারিলে গৃহস্থের সাধারণতঃ নিত্যব্যবহার্য্য শাক সব্জীর অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইবে আশা করা যায়।

K. K.

দামোদরের উচ্ছ্বাস বা ভীষণ প্লাবন।

ওই যে কাল-ভেরি বাজায় ঘনে ঘন,
সৃষ্টির বিনাশ-বার্ত্তা হৃদয়-কম্পন!
ওই শুন দামোদর করিল গর্জ্জন,
চারি দিক অন্ধকার ভীষণ দর্শন!
একি প্রকৃতির লীলা দেখি ভয়ঙ্কর!
মহাকাল ভীমবেশে ছাড়ে হুহুঙ্কার!
আসে জল হু হু করে দিগন্ত ব্যাপিয়া,
পশু পক্ষী নরনারী যাইছে ভাসিয়া!
ঘর দ্বার কিছু আর না রহে কাহার,
মুহূর্ত্তে যাইল ভাসি হাজার হাজার!
কেবা মাতা কেবা পিতা কেবা শিশু কার,
কেবা কারে মায়া করে সবার সংহার!
একি হেরি ভয়ঙ্কর পলকে প্রলয়,
কেন আজ এ বিধান তব দয়াময়!
কি পাপ করেছে এরা দণ্ড এই তার,
দিলে ওহে বিশ্বপতি করিয়া বিচার!
কেন দামোদর তুমি প্রচণ্ড এমন,
নাশিলে নির্দ্দয়ভাবে অসংখ্য জীবন?

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

বঙ্গমহিলার ব্রতকথা।

(সাবিত্রী ব্রত)

পুরাকালে পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, পৌরজনের প্রিয়পাত্র মহারাজ অশ্বপতি মদ্রদেশে রাজত্ব করিতেন। ধর্ম্মচারিণী, পতিব্রতা মালবী তাঁহার মহিষী ছিলেন। তিনি বন্ধ্যা ছিলেন বলিয়া রাজা বড়ই মনের কষ্টে কালাতিপাত করিতেছিলেন। অতঃপর তিনি সন্তান-কামনায় নিয়মিতাহারী, ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিলেন। তিনি সাবিত্রীমন্ত্রে প্রতিদিন লক্ষ বার আহুতি প্রদান করিয়া দিবসের ষষ্ঠভাগে পরিমিত ভোজন করিতেন। এইরূপে অষ্টাদশ বর্ষ অতীত হইলে সাবিত্রী দেবী তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্টা হইয়া মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন।

দেবী সাবিত্রী কহিলেন, "হে রাজন্! আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্টা হইয়াছি, অতএব তোমার অভিলাষানুযায়ী বর প্রার্থনা কর।" ইহা শ্রবণে মহারাজ অশ্বপতি বিনীতভাবে সাবিত্রী দেবীকে কহিলেন, দেবি! আমি অপত্যের কামনায় এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, অতএব এই প্রার্থনা, যেন আমার বহু পুত্র উৎপন্ন হয়।" তদুত্তরে দেবী কহিলেন, "বৎস! সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার প্রসাদে সত্বর তোমার একটী তেজস্বিনী কন্যা হইবে।" মহারাজ অশ্বপতি দেবীবাক্যে পরম সন্তোষ লাভ করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন এবং দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে মহিষী মালবীর গর্ভে অশ্বপতির লোকললামভূতা এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেন। সাবিত্রীমন্ত্রে আহুতি প্রদান করিয়া কন্যার জন্ম হওয়াতে মহারাজ কন্যার নাম "সাবিত্রী" রাখিলেন। সাবিত্রী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন এবং কালক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিলেন।

যৌবনে সাবিত্রীর রূপ-লাবণ্য এরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, তাঁহার কান্তি-প্রভায় অভিভূত হইয়া কোন রাজকুমারই তাঁহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে সাহসী হইলেন না। একদিন মহারাজ অশ্বপতি দেবীরূপিণী স্বীয় তনয়াকে প্রাপ্ত-যৌবনা অথচ বিবাহার্থী রাজকুমারেরা কেহই তাঁহার পাণিগ্রহণাভিলাষে প্রার্থনা করিতেছেন না দেখিয়া মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তদনন্তর একদিন নরপতি সাবিত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সাবিত্রি! তোমার সম্প্রদান কাল সমাগত, অথচ কোন রাজকুমারই আমার নিকটে তোমার

পাণিগ্রহণের অভিলাষ জ্ঞাপন করিতেছেন না। অতএব তুমি স্বয়ং মনোমত স্বামী নির্ব্বাচনপূর্ব্বক তাঁহাকে পতিত্বে বরণ কর, পরে আমি বিবেচনাপূর্ব্বক তোমাকে তাঁহার করে সম্প্রদান করিব।

মহারাজ অশ্বপতি কন্যাকে ও প্রবীণ অমাত্যগণকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার যাত্রার উপযোগী যান-বাহনাদির আয়োজন করিয়া তাঁহাকে গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সাবিত্রী স্বর্ণরথে আরোহণপূর্ব্বক বৃদ্ধ সচিববৃন্দপরিবৃতা হইয়া স্বীয় মনোমত পতি অনুসন্ধানার্থ রমণীয় তপোবন সকল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে একদা মহারাজ অশ্বপতি দেবর্ষি নারদ সহ সভামধ্যে উপবিষ্ট থাকিয়া কথোপকথনে কালাতিপাত করিতেছেন, এমন সময়ে রাজনন্দিনী সাবিত্রী নানা তীর্থ ও আশ্রমসমূহ পরিভ্রমণানন্তর পিতৃসদনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং পিতাকে নারদসহ উপবিষ্ট দেখিয়া অবনতমস্তকে উভয়ের চরণ বন্দনা করিয়া দণ্ডায়মানা রহিলেন। নরপতি স্বীয় তনয়াকে সমুপস্থিতা দেখিয়া তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতে আদেশ করিলেন। সাবিত্রী কহিলেন, পিতঃ! শবদেশে দ্যুমৎসেন নামে একজন বিখ্যাত ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয় নরপতি রাজত্ব করিতেন। কালক্রমে তিনি অন্ধ হইয়া পড়েন। এই সময়ে তাঁহার একমাত্র পুত্র সত্যবান্ জন্মগ্রহণ করেন। রাজাকে অন্ধ এবং রাজ্যপরিচালনে অসমর্থ দেখিয়া রাজ্যের সমীপবর্ত্তী বিপক্ষ নরপতি তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। তখন অন্ধ ভূপতি অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় পত্নী ও পুত্র সহ তপোবনে গমন করেন এবং তথায় তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া কালযাপন করিতেছেন। তাঁহার পুত্র সত্যবান্ রাজভবনে জন্মগ্রহণ করিয়া তপোবনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং তিনিই আমার উপযুক্ত ভর্ত্তা, এই ভাবিয়া আমি মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি।"

সাবিত্রীর এই কথা শ্রবণ করিয়া নারদ কহিলেন, "রাজন্! সাবিত্রী না জানিয়া সত্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ করিয়া মহা অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। কারণ সত্যবান্ সর্ব্বগুণ-বিভূষিত হইলেও, তাঁহার একমাত্র দোষ সমুদয় গুণকে অভিভূত করিয়াছে। সত্যবান্ অদ্য হইতে এক বৎসর পূর্ণ হইলে ক্ষীণায়ু হইয়া দেহত্যাগ করিবে।" এই কথা বলিয়া দেবর্ষি প্রস্থান করিলেন।

বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিবে? মহারাজ অশ্বপতি রত্নাভরণভূষিতা সাবিত্রীকে সত্যবানের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। অনন্তর সংবৎসর অতীত হইলে, একদিন সত্যবান্ পিতার আদেশে ফল ও কাষ্ঠ আহরণার্থ বনে গমন করিলেন; সতী সাবিত্রীও পতির অনুগামিনী হইলেন। কাষ্ঠ আহরণ করিতে যাইয়া সত্যবান্ দৈবক্রমে বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। যম তাঁহার সূক্ষ্মদেহ লইয়া যাইবার জন্য আগমনপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিয়া গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে,

পতিব্রতা সাবিত্রীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পশ্চাদ্গামিনী দেখিয়া যম মধুরবাক্যে বলিলেন, "সাবিত্রি! তুমি এই মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া কোথায় যাইতেছ? যদি স্বামীর সহিত গমন করিবে, তবে দেহ পরিত্যাগ কর। তোমার স্বামীর কাল পূর্ণ হইয়াছে, সেই জন্য তোমার স্বামী স্বকীয় কর্ম্মফল ভোগার্থ মদীয় ভবনে যাইতেছেন। জীবমাত্রেই কর্ম্মবশে জন্ম-গ্রহণ করে এবং কর্ম্মবশেই লয়প্রাপ্ত হয়।"

পতিপরায়ণা সাবিত্রী যমের কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তিসহকারে যমের স্তব করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মের স্বরূপ, উৎপত্তি ও উপা-দান এবং জ্ঞান, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির স্বরূপ ও লক্ষণ সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্ম্মরাজও তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎ-সমুদায় যথাশাস্ত্র বলিলাম; বৎসে, এক্ষণে গৃহে প্রতিগমন কর।"

সাবিত্রী কহিলেন, দেব! আমি স্বামীকে অথবা ভবৎসদৃশ জ্ঞানবান্ মহাপু-রুষকে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব? আপনি আমাকে কর্ম্মফল ও কর্ম্মবিপাক বুঝাইয়া দিয়া বাধিত করুন।" সাবিত্রীর এই কথা শুনিয়া যমের বিস্ময় উপস্থিত হইল। তিনি কহিলেন, বৎসে! তুমি অল্পবয়স্কা কন্যামাত্র। কিন্তু তোমার জ্ঞান পরমজ্ঞানী সনকাদি যোগিগণের ন্যায় দেখিতেছি। তুমি সত্যবানের দ্বারা অখণ্ড সৌভাগ্যশালিনী হইবে। আমি স্বয়ং তোমাকে এই বর দিলাম। এক্ষণে তুমি ইচ্ছানুযায়ী বর প্রার্থনা কর।"

এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীর নিকটে জীবের কর্ম্মফল, ও কর্ম্মবিপাক কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে সাবিত্রী বলিলেন, "দেব! সত্যবানের ঔরসে আমার যেন শত পুত্র জন্মলাভ করে, ইহাই আমার অভিলষিত বর। আর, আমার পিতারও যেন শত পুত্র জন্মে, শ্বশুরের চক্ষুলাভ হয় এবং তিনিও যেন পুনরায় হৃত রাজ্য প্রাপ্ত হন, ইহাও আমার অন্যতর ঈপ্সিত বর। আপনি জগতের প্রভু, অতএব এই বরও প্রদান করুন যেন আমি লক্ষ বৎ-সরের অবসানে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া, স্বামীসহ বৈকুণ্ঠে গমন করিতে পারি।" ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীর উপর পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি পরম সাধ্বী, অতএব যাহা মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছ, তৎসমস্তই সিদ্ধ হইবে।" অনন্তর যম সাবিত্রীর নিকটে তাঁহার প্রশ্নানুক্রমে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল কীর্ত্তন করিয়া সত্যবানের মৃত দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সাবিত্রীর সকল মনোরথ পূর্ণ হইল।

দেবী সাবিত্রী নিজ সতীত্ব-প্রভাবে যমরাজের নিকট হইতে মৃত পতির পুনর্জ্জীবন ও রমণীগণের ঈপ্সিত বর লাভ করিয়াছিলেন। রমণীর সতীত্বের নিকট ধর্ম্মরাজকেও পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ধন্য সাবিত্রি!

যত দিন জগতে নরনারীর বাসস্থান থাকিবে, ততদিন তোমার সতীত্ব-প্রভাব কীর্ত্তিত হইবে। তোমার আশীর্ব্বাদে যেন চিরকাল হিন্দুগৃহে আদর্শ সাধ্বী রমণী বিরাজ করেন।

শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ।

মৃত্যু।

কে কবে হারায়ে যায় তাই সদা ভয়!
তা'রি তরে পরিজন আকুলহৃদয়,
হাজার বাঁধনে বাঁধে, আরো বেশী করে
জড়ায়ে ধরিতে চায়!
অবহেলা করে
কোথায় নীরবে বসি তুমি হে মরণ!
হাসিতেছ শুধু যেন গোপনে কখন
গোপন বিহারী ওগো, ধীর মৃদু পায়
এসে তথা দেখা দাও, নিমেষে লুটায়
সকল বাঁধন হায়!
কে জানে কি সুরে
বাঁশরী বাজাও তুমি জীবন-বধূরে
মিলন-বিধুরা করি, ছুটে চলে যায়
তোমারে লইতে বরি' সকল হিয়ায়
শিব্র দেবতার বেশে!
কি পুলক তায়!—
মরতে পড়িয়া শুধু রহে হাহাকার!

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার দত্ত।

সায়াহ্ন।

(১)

আমরি আশ্চর্য্য শোভে সায়াহ্নে ধরণী,
সিন্দূরের সম অভ্র, রক্তিমবরণী।
পশ্চিম বিমানে হেরি,
দিবাকর কর ছাড়ি
হইতেছেন অস্ত যাইতে তৎপর,
দিঙ্মণ্ডল তখন হয় অন্ধকার।

(২)

কিবা শোভা পায় নভো হ্রামণিকিরণে,
কিবা শোভা পায় রবি পশ্চিম গগনে।
সায়াহ্নে পশ্চিমাকাশ,
পরে যেন তাম্রবাস,
শুভ্র, ছিন্ন, অভ্র হয় গণনা তাহায়,
নানা ভাব প্রকটন হয় দুজনায়।

(৩)

বিটপীর বিকসিত প্রসূন সকল,
ঝুর ঝুর ঝুরে হয় সবই নির্ম্মূল।
কোন কোন ফুল দেখি,
ফুটিয়া হ'য়েছে সুখী,
অলিগণ মধু পান করে না তখন,
নিশাচর প্রাণী কত করে বিচরণ।

(৪)

বহু বর্ণ ইন্দ্রধনু করে পরকাশ,
তারাগণ প্রকটনে শোভিত আকাশ।

দেখি আকাশের গায়,
নানা পট শোভা পায়,
শুক্লপক্ষে হিমদ্যুতি উগারে কিরণ,
হেরিলে এ সব শোভা মুগ্ধ হয় মন।

(৫)

রবি যবে অস্তাচলে করেন গমন,
রজনীর অন্ধকার আইসে তখন।

"সুখের শেষেতে দুঃখ,
দুঃখের শেষেতে সুখ,"
অনিবার বাঁধা আছে এ নীতি সংসারে,
কাকলীর ছলে উহা জানায় সবারে।

শ্রীনলিনীকান্ত দেব।
দি-পাকুড়িয়া।

আত্মতত্ত্ব জ্ঞান।

অন্তরে অন্তরে আত্মা চায় কি তা দেখ,
শান্ত দান্ত সমাহিত ভাবেতে নিরখ,
হেরিয়া পদার্থে যথা প্রেমে নিবসিত,
সথা রূপে পরমাত্মা জীবাত্মায় স্থিত,
যেন এক তরূপরি বসি দুই পক্ষী
ফলভোক্তা একটা অন্যটী তার সাক্ষী।
জীব ভোক্তা পরমাত্মা সদা অনশন
থাকি উভে উভয়ের প্রীতিতে মগন
আনন্দে যাপয়ে কাল—সৃজন কারণ,
নিগূঢ় সে তত্ত্বকথা না হয় বর্ণন।
স্বতন্ত্র পরম আত্মা জীবাত্মা অধীন
একের অধীনে হয় অপর স্বাধীন।
আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ইহা বেদান্তের সার,
লভিলে এ জ্ঞান যায় মোহ অন্ধকার।

ভূত না মানুষ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে বিবেচনা।

ভাবময়ীদের ভাড়া বাটীতে নন্দক, নন্দকের মাতা, চন্দনী, দেবদত্ত ও ভবভূতি বসিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের চিন্তা করিতেছিলেন।

পাঠকপাঠিকাগণ অসন্তুষ্ট হইবেন না, দেবদত্ত কেমন করিয়া এখানে আসিলেন তাহা আমি পরে আপনাদিগকে জ্ঞাত করিব। চন্দনীর মাতা কহিলেন, "নন্দক! তুমি অবলাদের উদ্ধার বিষয়ে বড়ই বিলম্ব করিয়া ফেলিলে। আমার বিশ্বাস, দুর্ব্বলা অবলা দুইজন ধূর্ত্ত চণ্ডদেবের নিকট হইতে আর অধিক দিন পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিবে না"। পশ্চাৎ হইতে দেবদত্ত গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিলেন "পবিত্রতা রক্ষা করিতে

পারিবে না ? চণ্ডদেব কেন, আমার বিশ্বাস সমস্ত পৃথিবী যদি এক সঙ্গে মিলিত হয়, তথাপি একজন ধার্ম্মিকা রমণীকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না, একটী পবিত্রচরিত্রা রমণীর পবিত্রতা নষ্ট করিতে পারিবে না"।

চন্দনীর মাতা কহিলেন "বলপ্রয়োগ"—

দেবদত্ত তাঁহার কথায় বাধা দিয়া আবার গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিলেন "বলপ্রয়োগ, আপনি ভারতভূমির কন্যা হইয়া বলেন কি ? প্রকৃত সতীর উপর বলপ্রয়োগ করিতে পারে এমন পশু, এমন নীচাশয়, এমন নরাধম, এমন ঘৃণিত, এ স্থানে কেন, পৃথিবীর কোনও স্থানে জন্মগ্রহণ করে নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমি ভরসা করি, আপনি এ অন্যায় কথার পুনরায় অবতারণা করিয়া আমাকে বিচলিত করিবেন না"।

ভবভূতি মস্তক আন্দোলন করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন "আমারও ঐ মত"। চন্দনীর মাতা দেবদত্তের মনের দৃঢ়তা সন্দর্শন করিয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিলেন এবং এবম্বিধ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক বলসমন্বিত স্বামী সকল মহিলাই যেন লাভ করেন বলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন।

তৎপরে চন্দনী কহিল, "এখনকার কর্ত্তব্য কি ?"

নন্দকের মাতা—এই ভাবেই ত ছয় মাস কাটাইলে, এখন যাহাতে কার্য্যের সফলতা করিতে পার তাহার উপায় কর।

দেবদত্ত—আপনি এখন কি করিতে বলেন ?

চন্দনীর মাতা—আমি নন্দককে প্রকাশ্যে চণ্ডদেবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে বলি। নন্দক মূর্খের ন্যায়, অন্ধের ন্যায়, অর্ব্বাচীনের ন্যায় বৃক্ষের মূলে জলসেচন না করিয়া শাখা প্রশাখায় জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছে। ঘরের মধ্যে চোর রাখিয়া সাধুদিগের পিছনে তাড়াইয়া বেড়াইতেছে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আমি তাহার গর্ভধারিণী জননী হইয়াও তাহার এই নির্ব্বুদ্ধিতা ও অর্ব্বাচীনতা সন্দর্শন করিয়া তাহাকে ধিক্কার প্রদান করিতেছি। আমি দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি যে, নন্দক যদি এ কর্ম্মত্যাগ না করে এবং দেবদত্ত যদি ইহা গ্রহণ না করে, তবে কিছুতেই এ কার্য্যে সফলতার সম্ভাবনা নাই।

দেবদত্তও তদনুরূপ দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "না কিছুতেই হইবে না। নন্দক ! তুমি চণ্ডদেবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হও; জননীর বাক্য মান্য কর, শোক সাগর হইতে, দুঃখ সাগর হইতে, অপমান ও নির্য্যাতন হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।"

নন্দক ললাটের স্বেদবিন্দু হস্তদ্বারা মুছিয়া ফেলিয়া দৃঢ় স্বরে কহিলেন "আপনারা সকলে স্থির হউন, আমি একাকীই তাঁহাদিগের উদ্ধার সাধন করিব"।

নন্দকের মাতা ও দেবদত্ত এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন "তুমি পারিবে না, নিশ্চয় পারিবে না।"

"পারিব, নিশ্চয় পারিব" বলিয়া নন্দক দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন।

"যদি চণ্ডদেবের বিরুদ্ধে যাও, তবে নিশ্চয় পারিবে, নচেৎ পারিবে না—ইহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দিতে পারি" বলিয়া দেবদত্ত ও নন্দকের মাতা ললাট হইতে উত্তেজনার স্বেদবিন্দু হস্ত দ্বারা মুছিয়া ফেলিলেন।

তখন ভবভূতি কহিলেন "এ কাজ চণ্ডদেবের নহে, ইহা কতগুলি ভূতের কাজ। আমি তাহার গোটা কতককে চোখেও দেখিয়াছি—বাপ্‌রে কত বড় মাথা, কি দীর্ঘ হাত, কত বড় জিহ্বা ও চক্ষু।" ভবভূতির কথা শুনিয়া চন্দনী ও চন্দনীর মাতার ওষ্ঠাধরে কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল। দেবদত্ত ক্রোধে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন, আর নন্দক অটল অচল হিমাদ্রির ন্যায় বসিয়া বলিয়া থাকিতেছিলেন।

চন্দনী কহিলেন "এবম্বিধ আকারের একটা ভূত বিষাক্ত ছুরিকা দ্বারা আমাকে আঘাত করিয়াছিল। সেই আঘাতে আমি মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম। ভূত আমাকে মৃত ভাবিয়া অশ্বের সঙ্গে বাঁধিয়া সেই ভূতের বনে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমি মরি নাই, বোধ হয় আমি অস্ফুট স্বরে কাঁদিয়া উঠিয়াছিলাম। ভূত আমাকে গলা ও মুখ টিপিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু সে সহস্র বুদ্ধিমান্ হইলেও তখন বুঝিতে পারে নাই যে আমি মরি নাই। ভাগ্যক্রমে নন্দক সেই দিন অশ্বারোহণে সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, তাই আমার ক্রন্দন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সে তখনি ভূতের বনে প্রবেশ করিয়া আমার মৃতদেহ বহন করিয়া আনিয়াছিল। বনে প্রবেশকালে তাহার ঘূর্ণায়মান তরবারি ভূতের অঙ্গ ছেদন করিয়াছিল। কিন্তু তৎকালে আমি মরি নাই, ভগবান্ জননীর সাহায্যে আমাকে বাঁচাইলেন। বাঁচিয়া উঠিয়া শুনিতে পাইলাম, সেই ভূতই চণ্ডদেব এবং চণ্ডদেবই যে এই রমণীহরণকারী দস্যুদলের প্রধান নেতা তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যদি কেহ ইহাতে প্রত্যয় করিতে না চাও, তবে তাহার হস্তে যে তরবারির আঘাতের চিহ্ন আছে তাহা দেখ।"

নন্দক অবিচলিত স্বরে কহিলেন "আঘাতের চিহ্ন দেখিয়া কি হইবে? এই ক্ষতচিহ্ন দেখিয়া কি ভাবময়ী ও প্রতিধ্বনির অপহরণকারীকে বাহির করিতে পারিব?"

চন্দনী। না পার চন্দনীর হত্যাকারীকেও ত বাহির করিতে পারিবে। মনে কর আমি মরিয়াই গিয়াছি, আর বাঁচি নাই।

নন্দক। কেমন করিয়া বাহির করিব?

চন্দনী। কেমন করিয়া কি? যে চন্দনীকে হত্যা করিয়াছিল, তোমার তরবারী তাহার অঙ্গে আঘাত করিয়াছিল, তাহা কোন সাধুকে আঘাত করে নাই, এ কথা ত ঠিক?

নন্দক। তাহাই বা কেমন করিয়া বলি। হয়ত আমার মত কোন নিরপরাধী সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

চন্দনী। তবে তিনি নীরবে চোরের মত চলিয়া গেলেন কেন? সাধু হইলে অবশ্যই কথা বলিতেন।

নন্দক। তাহারই বা প্রমাণ কি? আমিই কি কথা বলিয়াছিলাম?

চন্দনী—চণ্ডদেব যদি সাধুভাব লইয়া সেখানে যাইত, তবে সে অবশ্য তোমার নিকট সে কথা ব্যক্ত করিত।

নন্দক—তোমার বিবেচনায় তবে সে চণ্ডদেব?

চন্দনী—হাঁ, তখন তুমি অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে পার নাই, তাহার পরই সে হাতের ক্ষত বাঁধিয়া লোককে লুকাইতে চাহিল, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

নন্দক কোন কথাই কহিলেন না।

চন্দনী—নন্দক! তুমি প্রতিধ্বনির অপহরণকারীকে না ধরিতে পার, আমার হত্যাকারীকে ধর।

নন্দক—জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন—"তুমি তবে তোমার হত্যাকারীকে চণ্ডদেব বলিয়াই স্থির করিলে?"

চন্দনী—হাঁ সে নিশ্চয়ই চণ্ডদেব।

নন্দক—কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমার হত্যাকারী কে এ বিষয়ে আমি যেমন অজ্ঞ, চণ্ডদেবও তেমনি অজ্ঞ।

নন্দকের বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দনী ও তাহার মাতা উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন।

নন্দক—চণ্ডদেব তোমার নিকট বলিয়াছিল যে, কোনও কালোবেশধারী ভূত দ্বারা সে কখন কখন আক্রান্ত হয়।

চন্দনী—হাঁ।

নন্দক—ইহাও হইতে পারে যে, সেই ভূতই, চণ্ডদেবের হস্তে আঘাত করিয়া যত দোষ চণ্ডদেবের উপর ফেলিয়া দিয়াছে। ইহাও অসম্ভব নয় যে, অন্য কোন ব্যক্তি চণ্ডদেব সাজিয়া এই সব দুষ্কর্ম্ম সাধনপূর্ব্বক চণ্ডদেবের সুনাম ও সুযশ সব নষ্ট করিতেছে। হয়ত সেই ব্যক্তিই চণ্ডদেবের পিছনে পিছনে ভূত অথবা অপদেবতার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

চন্দনী—আমরা স্বচক্ষে চণ্ডদেবকে দেখিয়াছি, ইহাও কি বিশ্বাসযোগ্য নহে?

নন্দক—না, বিশ্বাসের অযোগ্য নহে, তবে চণ্ডদেবের আকৃতির মত আকৃতি অন্যেরও হইতে পারে। হয়ত সাধু চণ্ডদেব ভূত বিশ্বাস করেন, কিন্তু ভূত বিশ্বাস করা কাপুরুষের কর্ম্ম, সেই জন্য তিনি তাঁহার পিছনে ভূত লাগিয়াছে এ কথা জনসমাজে প্রকাশ করেন না। মিথ্যা চণ্ডদেব ভূত সাজিয়া সাধু চণ্ডদেবের পিছনে লাগিয়াছে এবং পুনরায় আসিয়া তোমার নিকটে ঐ কথারই আলোচনা করিয়াছে। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া চন্দনী কহিলেন "না ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? ইহা কখনই হইতে পারে না, চণ্ডদেবের

মত পাজি লোক এ পৃথিবীতে আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।"

চন্দনীর মাতা—নন্দক, তুমি এখন এ বক্র ভাব ত্যাগ করিয়া সোজা পথে চল, তোমার এ আঁকা বাঁকা কথা আমি বুঝিতে পারি না।

নন্দক—তোমার মুখে এ কথা সাজে না। যিনি মরিয়া নিজবুদ্ধিবলে বাঁচিয়া উঠিয়াছেন, দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া কত না বিদ্যা ও ছল কৌশল শিখিয়া আসিয়াছেন, যিনি আমাকে দুইবার সঙ্কটাপন্ন স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন, যিনি অদ্যাবধি জানি না কত শত ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, জ্ঞানহীন লোকের চক্ষুতে ধূলি দিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছেন, তিনি যে এই বাঁকা-টুকু বুঝিতে পারেন না, তাহাই বড়ই দুঃখের কথা, মা!

নন্দকের মাতা—আচ্ছা নন্দক তুমি কি বল, আমি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি. তুমি কি আমাকে তাহাও অবিশ্বাস করিতে বল? আমি যে স্বচক্ষে দেখিলাম নয় বৎসরের বালিকা চন্দনীকে টানিয়া ফেলিয়া চণ্ডদেব আমার গলা চাপিয়া ধরিয়া আমাকে বিষ পান করাই-বার জন্য পীড়ন করিতে লাগিল, তাহাও কি মিথ্যা বলিব? তবে কি তুমি আমার চক্ষু দুইটিকে তুলিয়া ফেলিতে বল?

নন্দক পূর্ব্ববৎ স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, "না না আমি তুলিয়া ফেলিতে বলি না, আরও দুইটি লাগাইতে বলি।"

নন্দকের মাতা—আরও দুটি লাগাইতে বল, একি! তুমি কি আমার সঙ্গে উপহাস করিতেছ?

নন্দক—না, চর্ম্মচক্ষুর পাশে আরও দুটি জ্ঞানচক্ষু লাগাইতে বলি। এই চক্ষু দুটি খুলিলেই দেখিতে পাইবে যে, আমি যাহা বলিতেছি তাহা সত্যও হইতে পারে।

চন্দনীর মাতা—আচ্ছা, তুমি তোমার সত্য নিয়া থাক, আমরা আমাদের মিথ্যা নিয়াই থাকিব।

ভবভূতি—না, চণ্ডদেব এ কাজ করে নাই বলিয়া আমারও বিশ্বাস।

চন্দনী—করে নাই? নিশ্চয়ই করিয়াছে। বর্ষাকাল আমাবস্তার রাত্রি, আমি ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়াছিলাম। বাহিরে ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, এমন সময় সমস্ত শরীর কাল কম্বলে আবৃত করিয়া চণ্ডদেব আমার ঘরে প্রবেশ করিল। সেই অশুভ ক্ষণে আমার নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও সেই বলশালী পশুর হস্তে আমার অমূল্য রত্ন, নারীগৌরবের প্রধান সামগ্রী অমূল্য ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিলাম। হায়, তখনি আমি মরিলাম না কেন? তখনি এ পাপ দেহ বিসর্জ্জন দিলাম না কেন। চন্দনী মুখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

চন্দনীর মাতা বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া চলিলেন, যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি বলিলেন "আমি চলিলাম, এখনি সে ক্ষিপ্ত পশুর মুণ্ড মুষ্টাঘাতে দ্বিখণ্ড

করিয়া ফেলিব।" নন্দক ও দেবদত্ত ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বসাইলেন এবং তাঁহাকে থামিতে দেখিয়া উভয়ে অতি বিমর্ষভাবে উপবেশন করিয়া বসন দ্বারা বাতাস করিতে লাগিলেন।

ভবভূতি কহিলেন—আমাদের বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে, স্ত্রীলোকের কথা লইয়া অধিক গোলমালও করা যায় না, তাহাতে কলঙ্ক হয়, অথচ নিজেরাও কিছু করিতে পারিতেছি না।

ক্ষণকালের মধ্যে চন্দনীর মাতা প্রকৃতিস্থ হইয়া পূর্ব্বস্থানে আসিয়া উপবেশন করিলেন। সকলেই কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন, কাহারও কথা কহিবার রুচি রহিল না। অনেকক্ষণ পরে ভবভূতি সে স্থানের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন "আমার বিশ্বাস, চন্দনীর মাতার ধারণা কোন কোন অংশে সত্য নহে। চণ্ডদেব চন্দনী ও প্রতিধ্বনিকে চুরি করিলে করিতে পারে, কিন্তু ভাবময়ীকে সে কেমন করিয়া চুরি করিল? ভাবময়ী যেখানে থাকিত, চণ্ডদেব তাহার সন্ধান জানিত না।" তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া চন্দনী ও তাহার মাতা অল্প হাস্য করিলেন। দেবদত্ত তাহার দিকে সম্মুখ করিয়া বসিয়া কহিলেন "আসুন, আমি আপনাকে ঘটনাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিই।"

"আমি ত সব শুনিয়াছি" বলিয়া ভবভূতি ঘাড় নাড়িলেন।

দেবদত্ত—আমার নিকট আরও একবার ভাল করিয়া শুনুন। চণ্ডদেব ও মানদেব দুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। চণ্ডদেবের মাতার মৃত্যুর পর গ্রহদেব চণ্ডদেবের মাতৃস্বসাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও মানদেবকে শৈশবেই ফেলিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। মানদেব অপেক্ষা চণ্ডদেবই পিতার অধিক প্রিয় ছিল। চণ্ডদেব চন্দনীর পিতাকে হত্যা করিলে গ্রহদেব মানদেবকে ত্যাগ করিয়া চণ্ডদেবের সঙ্গে এই দেশে আগমন করেন। গ্রহদেবের মৃত্যুর পর চণ্ডদেব পুনরায় উদ্ধত হইয়া উঠিল, কিন্তু ইহার ঔদ্ধত্য ইহার কৌশলগুণে বাহিরে অপ্রকাশিত থাকিত। চণ্ডদেব যে দিবস প্রতিধ্বনিকে ধরিয়া লইয়া যায়, সেইদিন চন্দনী ক্রোধের পরবশ হইয়া প্রকাশ করিয়া ফেলে যে, তাহার পিতৃহত্যার কথা এখনও তাহার স্মরণ আছে। চণ্ডদেব অথবা তাহার লোক তখন সেইখানে অলক্ষ্যে অবস্থান করিতেছিল। একথা তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে এবং সে সেই দিনই ভূত সাজিয়া চন্দনীকে হত্যা করে। তারপর সে চন্দনীর দেহ লইয়া ঘোটকারোহণে নন্দকের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। পথিমধ্যে নন্দকের সহিত ভাবময়ীর সাক্ষাৎ ও আলাপ সবই তাহার দৃষ্টিগোচর হয় এবং সেই সূত্রে সে ভাবময়ীর রূপগুণের বিষয় জানিতে পারে। এখন বুঝিয়া লউন, চণ্ডদেবের পক্ষে ভাবময়ীকে চুরি করা কি প্রকারে সম্ভব।

ভবভূতি—আমি সে ভূত চোখে দেখিয়াছি।

দেবদত্ত—সে চণ্ডদেবেরই চক্র ও কৌশল।

প্রথমে ভবভূতির নয়ন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং তিনি হস্ত পদ আস্ফালন-পূর্ব্বক ক্ষণকাল বৃথা গর্জ্জন করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন। তাহার পর ভাবময়ীর সেই পবিত্র মুখ স্মরণ করিয়া তাঁহার পিতৃহৃদয়ে স্নেহের উৎস উছলিয়া উঠিল। তিনি নতমুখে বসিয়া অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রোদন দেখিয়া সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল, এবং সকলে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে সচেষ্ট হইলেন। এইরূপ অশ্রুপাতে বহুক্ষণ কাটিয়া গেলে পর, দেবদত্ত স্থির হইয়া কহিলেন "এখন আর বৃথা অশ্রুজল ফেলিয়া সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই, এস সকলে একত্র হইয়া আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করি।"

চন্দনীর মাতা—বেশ দেবদত্ত! তুমি বেশ কথা বলিয়াছ, আমি তোমাকে এজন্য ধন্যবাদ দিতেছি। নন্দক! তুমি কি বল?

নন্দক—আমিও ঐ কথা বলি।

চন্দনীর মাতা—এখন কি করা কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে আমরাই তোমাকে উপদেশ দিতেছি। তুমি তোমার ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিবে না।

নন্দক এতক্ষণে একবার হাস্য করিলেন।

দেবদত্ত—আপনি নন্দককে কি বলিতে চান?

চন্দনীর মাতা—নন্দক এক্ষণে অলক্ষ্যে চণ্ডদেবের গৃহে বাস করিতে আরম্ভ করুন ও চণ্ডদেবের এবং তাহার সকল অনুচরবৃন্দের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখুন। আমরা তিন জনে যথাসাধ্য তাহার সহায়তা করিব। এইরূপ করিলেই অপরাধীর সন্ধান পাওয়া যাইবে।

দেবদত্ত—নন্দক! ইহা অতি উত্তম পরামর্শ, তুমি এই পথেই চল, ইহাতেই সুফল পাইবে।

নন্দক—হাঁ, কিছুদিন তদীয় গৃহে অবস্থান করা আমারও ইচ্ছা, কিন্তু অলক্ষ্যে নহে। গুরুদেব যে কি জন্য মানদেবকে সাধু জানিয়াও তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিলেন, তাহা জানা আমার নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে. অতএব কিছু দিন সেই গৃহে থাকিয়া পুরাতন চিঠি ও কাগজ পত্র দেখিলে সে বিষয়ের কিছু সন্ধানও পাইতে পারিব।

চন্দনীর মাতা—আচ্ছা তাহাই কর, অলক্ষ্যে না হয় প্রকাশ্যেই থাক, ফল কথা কিছুদিন চণ্ডদেবের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করা তোমার নিতান্ত কর্ত্তব্য।

নন্দক—তাঁহার উপরে আমি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছি, এ বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাক।

চন্দনী—চণ্ডদেবের সঙ্গে ধূর্ত্তমীতে পারিয়া উঠা কি তোমার কাজ?

চন্দনীর মাতা—আমারও সেই ভয়।

নন্দক—না, তোমাদের কোন ভয় নাই, তোমরা আমার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পার। আমি স্থির হইয়া চণ্ডদেবের নিকট অবস্থান করিব, তোমরা অন্তঃপুরের পরিচারিকাদিগের নিকট হইতে কোন

তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পার কি না দেখ। দেবদত্ত ভৃত্যদিগের সঙ্গে মিশুন ও তাহাদের নিকট হইতে কোনও সংবাদ পাইতে পারেন কি না দেখুন। ভবভূতি নিকট প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাস করুন, তাহাতেও কতক ফল পাওয়ার আশা আছে।

চন্দনীর মাতা ব্যঙ্গচ্ছলে কহিলেন "নন্দক এখন সিধা পথে আসিতেছেন, এই না তিনি চণ্ডদেবকে নির্দোষী বলিয়া ধার্য্য করিয়াছিলেন, আবার কেন চণ্ডদেবের গৃহে এরূপ পাহারা বসাইতেছেন?

দেবদত্ত—বোধ হয় ইহার মধ্যে তাঁহার কোন গুপ্ত অভিসন্ধি থাকিবে।

নন্দক—আমি দেখিতে চাই, চণ্ডদেব এই সব করিতেছেন, না অন্য কেহ চণ্ডদেবকে দোষী করিতে চায়। অতঃপর তাঁহারা সকলে নন্দকের কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন, এবং সকলে উঠিয়া গন্তব্য স্থানে চলিলেন। গমনকালে দেবদত্তের মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই অস্থিরতা নিবারণ করিবার জন্য তিনি মধুর স্বরে গান গাইয়া উঠিলেন,—

"ভালবাস, ভালবাস,
চাহিও না প্রতিদান,
পূর্ণপ্রাণ ঢেলে দিও
দিও না আধেক প্রাণ।
পূজা কর, পূজা কর
চেও না পূজার ফল,
পূজাই হউক তব
শুধু বাসনার স্থল।
ভালবাসা যত সুখ
পাওয়া তত সুখ নয়।
ভালবাসা থাকে থাক,
তায় হও তন্ময়।
হৃদয়ে স্থাপন করি
পবিত্র প্রণয়পাত্র
নীরবে ভজনা কর
পরশ ক'র না গাত্র।
ছুঁইলে পুরাণ হবে
ক্রমে হবে বিমলিন,
না ছুঁইলে প্রণয়ীর
শোভা বাড়ে দিন দিন।
তুমি যারে ভালবাস
তোমারি সে তোমারি সে,
থাক্ লুক্কায়িত সে যে
কি কাজ তার প্রকাশে।

অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা,
ঢাকা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কংগ্রেস—এবার করাচি নগরে কংগ্রেস বসিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রত্যাগমন—কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছেন। তিনি নির্ব্বিঘ্নে দেশে ফিরিয়া আসুন, এই আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা।

দাদাভাই নরৌজীর জন্মোৎসব—

স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত দাদাভাই নরৌজী বিগত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ৮৯ বৎসর বয়সে পদার্পন করিয়াছেন। তাঁহার এই শুভ জন্মদিন উপলক্ষে হিন্দু, পার্শী ও মুসলমান তিন সম্প্রদায়ের কয়েক জন মহিলা তাঁহার বাটীতে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিনন্দন দেন ও তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করেন। দাদাভাই তাঁহাদিগের কার্য্যে প্রীতিলাভ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা—বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ও লেডী হার্ডিঞ্জ মহোদয় ও মহোদয়ার স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য বিহারের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগন বাঁকীপুরে তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কার্য্যে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে, এইরূপ শুনা যাইতেছে।

শোক-সংবাদ—কুচবিহারের নবীন মহারাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বিলাতে অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন, এই সংবাদে আমরা যারপরনাই ব্যথিত হইয়াছি। শোকাহতা মাতা সুনীতি দেবীর এই গভীর শোকে আমরা ভগবানের নিকট তাঁহার সান্ত্বনা প্রার্থনা করি। তিনি শোকসন্তপ্তা জননীর প্রাণে শান্তি দিন ও পরলোকগত মহারাজার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

জলপ্লাবন—জাপানের রাজধানী টোকিও নগর জলে ভাসিয়া গিয়াছে। ১৫ হাজার বাড়ী ও বহু লোকের জীবন বিনষ্ট হইয়াছে। মান্দ্রাজেও প্রবল বৃষ্টিপাতে ঋষিকুল্যা নদীর উভয় কূল প্লাবিত হইয়া বহু স্থান জলে ভাসিয়া গিয়াছে। এ বৎসর নানা স্থান জলপ্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছে।

দ্বারবঙ্গেশ্বরের জননী বিয়োগ—গত ১১ই সেপ্টেম্বর দ্বারবঙ্গের মহারাজার মাতা ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

স্বদেশী মেলায় লর্ড কারমাইকেল—বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর ১৭২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে স্বদেশী মেলার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। লর্ড কারমাইকেল মেলার দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্য সম্পন্ন করেন ও তৎপরে বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতার প্রারম্ভে মেলার উদ্যোগকারিগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন, "স্বদেশী প্রকৃত পক্ষে স্বদেশপ্রেমের নামান্তর, ইহা স্বদেশপ্রেমের অভিব্যক্তি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। স্বদেশের শিল্পজাত দ্রব্যনিচয় এবং উৎপন্ন দ্রব্যের উন্নতি সাধন দ্বারা ভিন্ন দেশের পণ্যদ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করাই স্বদেশী মেলার লক্ষ্য। স্বদেশজাত দ্রব্যের উন্নতি দর্শন করিতে আমি অভিলাষী। আপনারা স্মরণ রাখিবেন, এই স্বদেশজাত শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে হইলে মূলধন ব্যতীত কোন কার্য্য সম্ভবপর নহে। আমি শুনিয়াছি, বঙ্গবাসিগণ সাধারণতঃ নিতান্ত দরিদ্র, কিন্তু আমি ইহাও জানি যে, এই বঙ্গদেশে অনেক অর্থবান্ লোক আছেন। এদেশের

উকীলগণ অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাঁহারা এই কার্য্যে অর্থ সাহায্য করিলে অনেকটা ফললাভ হইতে পারে।" পরে মেলার দ্রব্যাদি দর্শন করিয়া ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল ও ভারত-মহিলা সমিতির দোকান পরিদর্শন করিয়া তাহাতে আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করেন।

এম, এ, পরীক্ষার ফল—শ্রীমতী রোহিণী গুহ এবার এম, এ, পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম হইয়াছেন।

অদ্ভুত আবিষ্কার—Mr. Hamburger Nachrichtern এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, সম্প্রতি "বার্লিন" হোটেলে নবাবিষ্কৃত বাক্‌শক্তিযুক্ত ঘড়ির এক প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। প্রতি পনর মিনিট অন্তর, স্পষ্ট শুনা যায় যেন ঐ ঘড়িটী বলিতেছে "তিনটা বাজিল", "সোয়া তিনটা বাজিল" ইত্যাদি। এইরূপ একটী ঘড়ি গৃহে থাকিলে আমরা যে কোনও কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারি, কারণ ইহা সর্ব্বক্ষণই আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময় স্মরণ করাইয়া দিবে। সুতরাং আমরা যে কোন অবস্থায় থাকি না কেন, আমাদিগের কার্য্যের ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। যদি অন্ধকারে নির্দ্দিষ্ট সময় জানিবার আবশ্যক হয়, একটী কল টিপিয়া দিলেই নির্দ্দিষ্ট সময় জানা যাইবে। এইরূপ কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেই ইহা সব কথা বলিতে পারিবে, কিন্তু এই ঘড়িটীর উপরিভাগ দর্শনে ইহার এতাদৃশ অদ্ভুত শক্তির কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। "সেলেন" নামক কোন বার্লিনবাসীর অন্তরেই এই অদ্ভুত আবিষ্কারের ভাব উদয় হয় এবং পরে Max Markins নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক ইহা কার্য্যে পরিণত হয়। এক্ষণে এই ব্যবসায় চালাইবার নিমিত্ত ১৮৭৫০০০ টাকার মূলধন লইয়া একটী কোম্পানী খোলা হইয়াছে।

গুরু বরণ।

শাসিতে কে চাহে মোরে কর গো শাসন,
শাসিত হইতে চাহি ইঙ্গিতে তোমার,
কিন্তু গুরো, গুরুপদ লইও গো তুমি,
শিষ্য বলি আমারে গো দিও পদে স্থান।
যদি পার প্রবেশিতে হৃদয়ে আমার,
মিলিবারে দাও যদি মোরে তব সাথে,
তবেই করিব আমি শিষ্যত্ব স্বীকার,
নতুবা থাকগো দূরে—পূজিব তোমার।
শিশুর শাসন আর মানে না যে প্রাণ,
কল্যাণ-শাসনটুকু চাহিগো এখন,
যদিও অক্ষম আমি তব তুলনায়
তবু নহি শিশু আমি—প্রদীপ্ত যুবক।
জ্ঞান, শক্তি লভিবারে প্রাণ মম চায়,
সে শক্তি কোথায় গুরো দেখাও আমায়!

শ্রীমুনীন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

অবলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

মিস্ রায় নিরুপায় হইয়া বসিয়া পড়িলেন। নিম্নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সেই উচ্চ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করা তাঁহার নিকট সম্ভবপর মনে হইল না। পর্ব্বতে আরোহণ অপেক্ষা অবতরণ অধিক শ্রমসাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি নীরবে বসিয়া অবলার অসমসাহসিক কাণ্ড দেখিতে লাগিলেন।

পার্ব্বতীয় বন্য মৃগের ন্যায় শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে মিস্ ঘোষ উঠিতে লাগিল। তাহার এক পার্শ্বে গভীর খাদ, অপর পার্শ্বে দুর্লঙ্ঘ্য উচ্চ পর্ব্বত, কিন্তু রমণীর মন টলিল না। কত স্থানে তাহার পদস্খলন হইল, কতবার তাহার হস্তাকর্ষিত লতা ছিন্ন হইল, কতবার তাহার কম্পিত দেহলতা খাদে হেলিয়া পড়িল, কিন্তু জ্ঞানহারা বালিকা বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া উন্মত্তের ন্যায় উপরে উঠিতে লাগিল।

নিম্নে মিস্ রায় উন্মুখিনী হইয়া দেখিতে লাগিলেন। অবলা কি সত্যই উন্মত্ত হইয়াছে, প্রাণের মমতা, জীবনের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া সত্যই কি সে বিপদের সহিত খেলা করিতেছে? তাহার প্রতি পদস্খলনে তিনি চমকিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন—বুঝি বা সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। ভয়ে তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

ইতিমধ্যে শ্রান্ত ও স্বেদসিক্ত হইয়া মিস্ ঘোষ নিকটস্থ প্রস্তর-খণ্ড অবলম্বন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। সহসা কেমন একটা দারুণ আশঙ্কায় তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। নিম্নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে দেখিল,—কি সর্ব্বনাশ! সেই বিপুল শিলাখণ্ডগুলি লঙ্ঘন করিয়া নামিবার কোন উপায় নাই। তাহার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, পা কাঁপিতে লাগিল।

সহসা পরিচিত কণ্ঠ-স্বর শ্রুত হইল! এ কি! মিষ্টার কর কোথা হইতে আসিলেন? মিষ্টার কর চীৎকার করিয়া কহিলেন, "মিস্ ঘোষ অপেক্ষা করুন। আর উঠিবেন না। আমি উপরে উঠিতেছি!"

প্রত্যূষে রবিরশ্মি যেমন কুজ্ঝটিকারাশি দূর করিয়া দেয়, গর্ব্ব আসিয়া মিস্ ঘোষের অন্তরের আতঙ্ককে তেমনি দূরীভূত করিল। উপহাসের আশঙ্কা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। প্রাতঃকালের কথোপকথন স্মরণ করিয়া ঘৃণা ও লজ্জায় তাহার অন্তর পূর্ণ হইল। তাচ্ছিল্যভাবে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"কেন? আপনি একলা কখনও ডেন্‌জেরাস্ পয়েণ্টে উঠিতে পারিবেন না। আমি নিজে অনেক বার চেষ্টা করেছি, এজন্য আমি খুব ভাল জানি।"

ইহাতে ঘৃণাব্যঞ্জক-স্বরে মিস ঘোষ বলিল, "বটে! আপনি বেশ্ জানেন! তবে, আজ আমি আপনাকে দেখাইব যে মেয়েরা সব পারে।"

এই বলিয়া অবলা পুনরায় অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহার ক্ষীণ দেহ মুহুর্মুহু কাঁপিতেছিল, তাহার চরণ পদে পদে স্খলিত হইতেছিল। অন্তরের অন্তস্তলে তাহার ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছিল। জীবনের মমতা ও আত্মসম্মান, ভয় ও গর্ব্ব পরস্পর যুঝিতেছিল। শেষে আত্ম-সম্মানের জয় হইল। মরণ ত নিশ্চিত, তবে অপযশের কালিমায় কেন সে আপনাকে কলঙ্কিত করে? জীবনের মায়ায় বিসর্জ্জন দিয়া সে অকুতোভয়ে পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল। প্রশান্ত বাবুর ব্যর্থ চীৎকার পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হইয়া তাঁহার নিকটই ফিরিয়া আসিল। কালবিলম্ব না করিয়া প্রশান্ত বাবু ও সুখন সিং তড়িদ্‌বেগে পর্ব্বতের উপর উঠিতে লাগিলেন।

এবার মিস্ রায়ের চীৎকার শ্রুত হইল, "মিস্ ঘোষের জন্য আপনারা ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন? তিনি আপনাদের সাহায্যের অপেক্ষা করেন না। আমি নামিতে পারিতেছি না। আপনারা আমাকে নীচে লইয়া যান।"

পুরুষেরা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অবশেষে মিস্ রায়ের অনুরোধ-মিশ্রিত আদেশ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সুখন সিং প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পাহাড়ী সুখন সিংএর সহায়তায় তাঁহার পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে বিলম্ব হইল না।

তাঁহারা যখন সানুদেশে পৌঁছিলেন, তখন মিস্ ঘোষ ও প্রশান্ত বাবু অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। অপেক্ষা না করিয়া সুখন সিং প্রশান্ত বাবুর উদ্দেশে ছুটিল। একাকী মিস্ রায় নীরবে বসিয়া লাঞ্চের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মিস্ ঘোষ কিরূপে সেই পথহীন পিচ্ছিল পর্ব্বতগাত্র অতিক্রম করিয়া টাইগার-রক্‌'র শৃঙ্গে উঠিলেন, তাহা আমাদের নিকট একটা সূক্ষ্ম সমস্যা। রোষ ও অপমানের পীড়নে উন্মত্ত হইয়া, জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া, বিপদকে আলিঙ্গন করিয়া, মিস্ ঘোষ বন্য মৃগের মত শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ডেন্‌জেরস্ পয়েণ্টে পৌঁছিতে এখনও ৫০০ গজ বাকী আছে। বালিকা আর পারিল না। তাহার দৈহিক বল একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহার শারীরিক শক্তি সমুদায় নিঃশেষ হইয়াছিল। উপহাসের আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়া সে এতক্ষণ যুঝিয়াছিল। প্রতি পদবিক্ষেপে যে তাহার বলের হ্রাস হইতেছে, তাহার শক্তি শেষ সীমায় আসিয়া ঠেকিতেছে, সে তাহা অনুভব করিতেছিল। আরও ৫০০ গজ খাড়া পাহাড়ে ওঠা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। বালিকা লজ্জিত, মর্ম্মাহত ও হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। শেষে তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল, তাহার গর্ব্বিত হৃদয় আজ ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া

সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হইল। কিন্তু তাহার শ্রান্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহের বেদনা-পীড়িত চরণ আর অগ্রসর হইল না। অবসাদে অবনত হইয়া সে বসিয়া রহিল। তাহার বক্ষের প্রতি স্পন্দন পরাজয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ অদূরে কাহার পদশব্দ প্রতিধ্বনিত হইল। প্রশান্ত বাবুকে দেখিয়াই ক্ষিপ্তের মত বালিকা উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষিপ্তের মত অস্থির-পদে সে আবার চলিতে লাগিল। কতক দূর অগ্রসর হইয়া যেমন সে শৃঙ্গান্তরে লম্ফপ্রদান করিল, সহসা উপরের এক খণ্ড পাথর কাঁপিয়া উঠিল। ঠিক্ সেই সময়ে প্রশান্ত বাবুর আর্ত্ত চীৎকার শ্রুত হইল, "ফিরে আসুন, ঈশ্বরের দোহাই! ফিরে আসুন। এখনি সর্ব্বনাশ হবে।"

তাঁহার স্বর এত করুণ, এমন মর্ম্মস্পৃক্ যে, মিস্ ঘোষ আর উপেক্ষা করিতে পারিল না। বালিকা তৎক্ষণাৎ সে শৃঙ্গ ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিল। সেই মুহূর্ত্তেই পূর্ব্বোক্ত শৃঙ্গ হইতে একটা বিশাল প্রস্তরখণ্ড খসিয়া পড়িল। পর্ব্বতমালা কম্পিত ও দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া সশব্দে সেই প্রস্তরখণ্ড নিম্নে নামিতে লাগিল। পরে গভীর খাদে পড়িয়া পাথরের চাঁই-খানা ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল।

সেই দারুণ কম্পন, সেই কর্ণবধির শব্দ বালিকা সহ্য করিতে পারিল না। তাহার শ্রান্ত চরণ এবার স্খলিত হইল। অস্ফুট চীৎকার করিয়া হতভাগিনী দুই হাতে লতা, গুল্ম, বৃক্ষশাখা আঁকড়াইয়া ধরিল। ভাগ্যক্রমে দৃঢ়মূল লতা উৎপাটিত হইল না। সেই গভীর শূন্যে রমণী ঝুলিতে লাগিল।

ভয়ে তাহার মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল। মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। আর অধিক বিলম্ব নাই—অচিরেই তাহার শ্রান্ত হস্ত স্খলিত হইয়া পড়িবে। জীবনের মায়া এখন তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তাহার বাঁচিবার সাধ প্রবল হইল। হতাশ হইয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল, ব্যাকুল হইয়া সে প্রার্থনা করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ একখানি হাত বজ্র-কঠিন মুষ্টিতে তাহার প্রকোষ্ঠ চাপিয়া ধরিল। ধীরে ধীরে তাহার দেহ শূন্য খাদ হইতে উত্তোলিত হইল। পুনরায় পদদ্বয় অবলম্বন পাইল। আনন্দাশ্রু তাহার গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

প্রশান্ত বাবু বলিলেন, "আমার স্কন্ধ ধারণ করুন।" দ্বিরুক্তি না করিয়া অবলা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। প্রশান্ত বাবু তাহাকে পৃষ্ঠে তুলিয়া লইলেন।

ধীরে ধীরে তাঁহারা অবতরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিক দূর তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাঁহাদের গতি রুদ্ধ হইল। প্রবল প্রস্তর-পাতে অসমতল পর্ব্বত-গাত্র সমতল হইয়া গিয়াছে, প্রস্তর-ঘর্ষণে বৃক্ষ লতা সব ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এক পার্শ্বে উন্নত সমতল পর্ব্বতগাত্র, অপর পার্শ্বে গভীর নিম্ন উপত্যকা তাঁহাদিগকে যেন বিদ্রূপ করিয়া হাসিতেছিল।

ব্যথিতা, ভয়াকুলা অবলা প্রশান্ত বাবুকে চাপিয়া ধরিল। ধিক্কারে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল, তাহার আশৈশব-সঞ্চিত দম্ভ ও গর্ব্ব আজ চূর্ণবিচূর্ণ হইল! কাঁদিতে কাঁদিতে সে কহিল, "কেন আসিলাম?"

বালিকাকে সান্ত্বনা দিয়া প্রশান্ত বাবু বলিলেন, "ভাগ্যে আমি সময়ে পৌঁছিয়াছিলাম। না হইলে কি সর্ব্বনাশই হইত।"

অবরুদ্ধ কণ্ঠে অবলা বলিল, "না, না, মরণই আমার ভাল ছিল। মৃত্যুই আমার উপযুক্ত শাস্তি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রশান্ত বাবু ধীরভাবে বলিলেন, "মিস্ ঘোষ আমাদের উদ্ধারের কোন উপায় দেখিতেছি না। বলিতে সাহস হয় না, আপনি মরিতে প্রস্তুত কি?"

অবলা শিহরিয়া উঠিল। আপনাকে সংযত করিয়া উত্তর করিল, "প্রস্তুত—আপনার সঙ্গে মরিতে আমার দুঃখ নাই।"

এই আসন্ন সময়েও কৌতূহল-স্পৃহা প্রশান্ত বাবুকে ছাড়িল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি আপনি আমাকে ঘৃণা করেন না?"

"আপনার যত্ন, স্নেহ আমি কখনও তুচ্ছ করিতে পারিতাম না। অনেক পূর্ব্বেই আপনাকে আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম। কিন্তু বিবাহ করিলে আমার স্বাধীনতা নষ্ট হইবে, সেই ভয়ে আমি এতদিন নীরব ছিলাম।"

প্রশান্ত বাবু নীরবে সেই অশ্রুপ্লাবিত গণ্ডযুগল চুম্বন করিলেন। যুবতীর পক্ষে আজ আর কোন আপত্তি উঠিল না। মরণের দ্বারপ্রান্তে সে আর আপনাকে প্রতারণা করিতে পারিল না। রমণী রমণীই, পুরুষ নয়।

সেই নীরব নিস্তব্ধ পর্ব্বতশৃঙ্গে প্রণয়ি-যুগল অবিচলিতচিত্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হৃদয় এতই পূর্ণ যে, কাহারও বড় বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না।

কয়েক ঘণ্টার পর অদূরে অস্পষ্ট শব্দ শ্রুত হইল। প্রশান্ত বাবু স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন। ঝর্ ঝর্ করিয়া উৎপলখণ্ড ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এ কি! সহসা এমন কেন হইল?

হঠাৎ একটা বৃহৎ রজ্জু তাঁহাদের দৃষ্টি-গোচর হইল। তাঁহারা বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কে এই দুর্লঙ্ঘ্য শৃঙ্গ-চূড়ে রজ্জু নিক্ষেপ করিল।

প্রশান্ত বাবু বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার মনে পড়িল, প্রাতে সুখন সিং বলিতেছিল যে, এ শৃঙ্গে উঠিবার জন্য পথ আছে। সে নিশ্চয়ই সেই পথ দিয়া পাহাড়ে উঠিয়া তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য রজ্জু নিক্ষেপ করিয়াছে।

কিন্তু রজ্জু এখনও অনেক ঊর্দ্ধে আছে, এখনও তাহাদের আয়ত্তের অতীত। দড়িগাছটি হেলিতেছে, দুলিতেছে, নামিতেছে, উঠিতেছে। তাঁহাদের মন সেই দড়ির উপর রহিয়াছে। স্থির দৃষ্টিতে তাঁহারা

সেই রজ্জুটী লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ইহার উপরই তাঁহাদের মুক্তি, তাঁহাদের জীবন নির্ভর করিতেছে।

কিন্তু হায়! রজ্জুটী অধিক দূর নামিল না—প্রশান্ত বাবুর আয়ত্তের মধ্যে কোন মতে আসিল না।

অনন্যোপায় হইয়া তাঁহারা উভয়ে যুক্তি করিয়া এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। বহু কষ্টে তাঁহারা দড়িগাছটি আঁকড়াইয়া ধরিলেন।

* * * * *

দুই ঘণ্টা পরে তাঁহারা সকলেই সেই পর্ব্বতের উপত্যকায় মিলিত হইলেন। অভুক্ত ও ক্ষুধিত মিস্ রায় রাগে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "ছিঃ ছিঃ, আপনাদের কি কাণ্ড! অবলারই অধিক দোষ? আপনি অবলার কাছে এ সব কথা পাড়িলেন কেন?"

"আমি কি জানি অবলা সত্য সত্যই পাহাড়ে উঠিবে?"

"আপনি এতদিনে অবলাকে চিনিতে পারিলেন না? সন্ধ্যা হ'ল, কিন্তু আপনাদের জন্য আমার এখনও লাঞ্চ খাওয়া হ'ল না।"

অবলা, প্রশান্ত বাবু ও সুখন সিং পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই অকূল বিপদ, কৃতান্তের সহিত সেই তুমুল সংগ্রাম, সেই অপ্রত্যাশিত মুক্তির ব্যাপার মনে পড়িল। মিস্ রায়ের কথা শুনিয়া তাঁহাদের হাসি আসিল। অবলা আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না।

আভ্যন্তরিক হাস্যের সমস্ত আভাস মুখ হইতে দূর করিয়া প্রশান্ত বাবু অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, ঠিক ত। অবলা তোমার হাসা অন্যায়। মিস্ রায়, আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করছি অবলাকে আর কখন এইরূপ অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দিব না।

মিস্ রায় রাগে গরগর করিতে করিতে বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, "বটে—আপনার শক্তি বেড়েচে দেখছি?"

এবার অবলা হাসিতে হাসিতে কহিল, "হাঁ, ভাই লতিকা, প্রশান্ত বাবু বড়ই বলবান্। তিনি আমাকে পর্য্যন্ত জয় করে ফেলেচেন।

শ্রীযতীশ চন্দ্র বসু, এম, এ,
ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

বিজ্ঞান-রহস্য।

দেহতত্ত্ব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।—নাড়ী-প্রকরণ।

"সার্দ্ধ ত্রিকোট্যোনাড্যোহি স্থূলাঃ সূক্ষ্মাশ্চ দেহিনাম্। নাভিকন্দনিবদ্ধাস্তা স্তির্য্যগূর্দ্ধমধঃ স্থিতাঃ॥

দেহীদিগের শরীর মধ্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ নাড়ী আছে। ইহারা নাভিমূলে নিবদ্ধ থাকিয়া তির্য্যক, ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে অবস্থিত রহিয়াছে। সুশ্রুত বলেন ইহাদিগের প্রত্যেকের মুখ প্রতি লোমকূপে নিবদ্ধ। সুতরাং মানব-দেহে সার্দ্ধ তিন কোটি লোমকূপও আছে। মহর্ষি পরাশর এই মতের প্রতিপোষক। তিনি বলিয়াছেন,

"তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ যানি
লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥

মানবের যে সার্দ্ধ তিন কোটী লোম আছে, যে স্ত্রী ভর্ত্তার অনুগমন করেন তিনি তাবৎ কাল অর্থাৎ সেই সার্দ্ধ তিন কোটী বৎসর স্বর্গবাস করেন।

স্থূল নাড়ী সকল দৃষ্টিগোচর হইলেও সূক্ষ্ম নাড়ী সকল সর্ব্বথা দৃষ্টির বিষয় নহে। পুরাকালে অণুবীক্ষণের ন্যায় যে কোন দূর-দৃষ্টির যন্ত্র ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ বা নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু তখন জ্ঞানচক্ষু ও তপশ্চক্ষু প্রবল থাকাতে তদ্দ্বারাই সমস্ত পরিদৃষ্ট হইত। তজ্জন্য উক্ত আছে

"ন শক্যাশ্চক্ষুষা দ্রষ্টুং দেহে সূক্ষ্মতমেন
বিভুঃ।
দৃশ্যন্তে জ্ঞানচক্ষুর্ভিস্তপশ্চক্ষুর্ভিরেব চ।"

নাভিচক্র শরীরের মধ্যবর্ত্তী। ইহাতেই নাড়ী সকলের মূল নিবদ্ধ। প্রাণীদিগের প্রাণ ও নাভিতে অবস্থিত। নাভি প্রাণের আশ্রিত ও শিরা দ্বারা আবৃত।

এই সার্দ্ধ ত্রিকোটি নাড়ীর মধ্যে দ্বিসপ্ততি সহস্র স্থূল নাড়ী। এইগুলি দেহের যন্ত্রা বা শ্রেষ্ঠা ধমনী. ইহাদিগের দ্বারা বাক্, শ্রোত্র, নাসিকা, ত্বক্ ও রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও তাহাদিগের গুণ, রূপ, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ও রস প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই নাড়ী সকলের মধ্যে সপ্ত শত সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। এই সকল ছিদ্র অনবরত অন্ন-রস বহন করিয়া শরীরের পুষ্টি বর্দ্ধন করিতেছে। শত শত অন্তস্রাবিণী নদ-নদী কর্ত্তৃক সমুদ্র যেমন আপুরিত হইয়া থাকে, এই সকল রসস্রাবী ছিদ্র কর্ত্তৃকও সেইরূপ নরদেহ পরিবর্দ্ধিত হয়। নাভিমূল-স্থিত এই সপ্তশত শিরা দ্বারা আপাদমস্তক সমস্ত শরীর চর্ম্ম-রজ্জুবদ্ধ মৃদঙ্গের ন্যায় আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই সপ্ত শত শিরার মধ্যে চতুর্ব্বিংশতিটী শিরা ব্যক্ত। ইহাদিগের অবস্থানের বিষয়ে দত্তাত্রেয় সংহিতায় এইরূপ উক্ত আছে। "দেহী-দিগের নাভিদেশে একটী কূর্ম্ম তির্য্যকভাবে অবস্থিত, তাহার বাম দিকে মুখ ও দক্ষিণে পুচ্ছ, ঊর্দ্ধভাগে বাম হস্ত ও বাম পদ এবং অধোভাগে দক্ষিণ হস্ত ও দক্ষিণ পদ। উহার মুখে দুইটী নাড়ী ও পুচ্ছে দুইটী নাড়ী, দুই পদে ও দুই হস্তে পাঁচ পাঁচটী করিয়া বিংশতি নাড়ী আছে। সমুদায়ে চতুর্ব্বিংশতি নাড়ী বা শিরা ব্যক্ত। সুশ্রুতের মতে নাভির ঊর্দ্ধগা দশটী প্রধান ধমনী, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রশ্বাসোচ্ছ্বাস, জৃম্ভিত, ক্ষুৎহসিত কথিত, রুদিত প্রভৃতি অভিবহন করিয়া

শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছে। হৃদয় অস্থিপ্রপঞ্চেও ত্রিশটী নাড়ী আছে। বাত, পিত্ত, কফ, শোণিত, রস বাহী দুইটি করিয়া দশটী নাড়ী, দুইটা নাড়ী দ্বারা বাক্য উচ্চারিত হয়, দুইটী নাড়ী ঘোষ বা শব্দবাহী, দুইটী নিদ্রাবাহী, দুইটী প্ররোচিত বাহী, দুইটী অশ্রুবাহী এবং দুইটী স্তন্যবাহী বা পুরুষের শুক্রবাহী নাড়ী—এই ত্রিশটীও প্রধান ধমনী। পাণি হইতে পদ পর্যান্ত একটী মাত্র শিরা বিন্যস্ত আছে, সেইটাই পরীক্ষিত নাড়ী। পুরুষের দক্ষিণ কর ও পদ এবং স্ত্রীলোকের বাম হস্ত ও পদ পরীক্ষা করা হইয়া থাকে।

দত্তাত্রেয়সংহিতায় ইহার কারণ নির্ণীত আছে। যথা, স্ত্রীলোকের নাভিস্থ কূর্ম্ম উর্দ্ধমুখে এবং পুরুষের নাভিস্থ কূর্ম্ম অধোমুখে অবস্থাপিত, অভিমুখের ব্যতিক্রম বশতঃ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাব হয়। দুই হস্তে, দুই পদে, কূর্ম্মের দুই পার্শ্বে এবং নাসিকার দুই রন্ধ্রে, যে আটটী নাড়ী আছে, তদ্দ্বারা জীবের সঞ্চার অবগত হওয়া যায়। কণ্ঠনাড়ী দ্বারা আগন্তুক জ্বর, তৃষ্ণা, আয়াস, মৈথুনক্রম, ভয়, শোক এবং কোপ নিদর্শিত হয়। নাসা নাড়ী দ্বারা মরণ, জীবন, কাম, কণ্ঠরোগ, শিরোরোগ, শ্রবণ ও আননজাত রোগ সকল নিদর্শিত হয়। চরমক্ষণে কারণ বিশেষে বিশেষ বিশেষ স্থানও পরীক্ষা করা হয়, যথা, হস্ত, পদ, কণ্ঠ, নাসা, নেত্র, কর্ণ, জিহ্বা ও শিশ্নের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থলে প্রাণবোধনার্থ নাড়ী পরীক্ষিত হইয়া থাকে। স্পর্শন, পীড়ন, আঘাত, বেধন, মর্দ্দন, স্বেদ এবং দাহ এই সকল উপায় দ্বারাও জীবের সঞ্চার পরীক্ষা করা যায়।

নাড়ী-বিজ্ঞান হইতে গৃহীত।

(ক্রমশঃ)।

বামাবোধিনীর জন্মদিনে নিবেদন।

১

অদ্ধ শতাব্দীর আসনে—হায়!
জীবনের কত দিন যায়,
পশ্চিমে পড়িছে বেলা, সাগরে ডুবিবে ভেলা
নিতে হবে নিঠুর বিদায়—
সর্ব্ব কার্য্য অবসান, ঘুমাইবে দীন প্রাণ,
নীরব নির্জ্জন নিরালয়।

২

জগতে তো চলে যায় সবি,
পড়ে থাকে অতীতের ছবি,
বিভুর মঙ্গল হস্ত, দুনিয়ায় সদা ব্যস্ত,
সাক্ষী নীলাকাশে শশী রবি।
এ ক্ষুদ্র এ তুচ্ছ প্রাণ, এও সে বিধির দান,
কাজ শেষে ফুরাইবে সব।

৩

আমি যাঁর মানসী দুহিতা,
কোথা সেই স্নেহময় পিতা!
নাহি জানি কোন্ স্বর্গে, পূজিছে অমর-বর্গে,
আমি হেথা শোক-সন্তাপিতা।
তবু যে আছে এ দেহ, তাঁরি আশীর্ব্বাদ স্নেহ,
বুকে সেই অমৃত কবিতা!
প্রাণ সঁপি মহাব্রতে, তাঁরি প্রদর্শিত পথে
চলিতেছি হইয়া বিনীতা।

৪

থাক্ থাক্ পুরাণ কাহিনী—
এস মোর বঙ্গীয় ভগিনি,
তোমরা বেসেছ ভাল, তাই তো পেয়েছি আলো,
বাঁচাইছ মমতা প্রদানি,
আমার ডুবিছে ভেলা, পশ্চিমে পড়িছে বেলা,
কবে সব ফুরাবে কি জানি!—
সে তামসী সন্ধ্যাক্ষণে, তোমরা রাখিও মনে,
তোমাদেরি এ "বামাবোধিনী।"

বামাবোধিনী—

নূতন সংবাদ।

১। এদেশীয় স্ত্রীলোকগণের সেবা ও চিকিৎসার জন্য মহিলা-সেবা-সঙ্ঘ নামে একটি দল গঠিত করিবার জন্য লেডী হার্ডিং প্রস্তাব করিয়াছেন এবং তাহার উদ্যোগও হইতেছে। আপাততঃ ভারতের ও ইংলণ্ডের ২৫ জন লেডী ডাক্তার লইয়া এই সেবা-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

২। আসানসোলের অন্তর্গত এথোরা স্কুলের ছাত্রাবাস নির্ম্মাণের জন্য মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ১৯৫৩১৲ টাকা, বাবু প্রসন্ন কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৬ হাজার এবং বাবু পঞ্চানন ও কুমারকৃষ্ণ নন্দী চৌধুরী ২০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৩। সম্প্রতি মড এলেন নাম্নী এক বিলাতী বিখ্যাত নর্ত্তকীর এদেশে আসিবার কথা হইতেছে এবং ইহার প্রতিবাদও চলিতেছে। এই রমণীর এদেশে আগমন না হইলেই মঙ্গল।

৪। কুচবিহারের রাজাসনে দ্বিতীয় রাজকুমার জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আমরা নবীন মহারাজার ও বরদার রাজকুমারী রাজ্ঞী ইন্দিরার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি। ইঁহারা প্রজাবৎসল হইয়া স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি, ও মুখ উজ্জ্বল করুন্।

৫। আজকাল রেলপথে যাত্রাকালে প্রায়ই মহিলাদিগের গাড়ীতে চুরি ও হত্যা প্রভৃতি হইয়া থাকে। এজন্য রেল

গাড়ীতে স্ত্রীলোকগণের আত্মরক্ষার জন্য নারী প্রহরী রাখিবার প্রস্তাব হইতেছে।

৬। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, শ্রীমতী পলেয়ার নাকি পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে নোলক পরিবার প্রথা প্রচলন করিতে চান। এ মন্দ মত নয়!

৭। গত ২২শে ভাদ্র বামাবোধিনীর একপঞ্চাশৎ জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন ইহার লেখক লেখিকা, হিতার্থি-মহিলাবৃন্দ ও মহোদয়গণ সম্মিলিত হইয়া ইহার দীর্ঘজীবন কামনা ও সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির বিষয়ে আলোচনা করেন। ব্রহ্মোপাসনা ও সঙ্গীতের পর সুবিখ্যাত লেখিকা শ্রীমতী মানকুমারী বসু স্বরচিত একটী কবিতা ও জন্মদিনের অন্যান্য প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। তৎপরে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় পৌরাণিক গল্পচ্ছলে একটী সুন্দর উপদেশ দেন। কবিরত্ন মহাশয়ের উপদেশ পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বামারচনা।

বামাবোধিনীর জন্মদিনে উপহার।

দুঃখিনী ভারত মাতা রত্নপ্রসবিনী।
গুণী পুত্র আছে কত তাই গৌরবিনী॥
ভারতের নারিজাতি অতি দীনহীনা।
কবিত্বের কিবা জানে সম্পদবিহীনা॥
বামাদের পাঠামাত্র এ বামাবোধিনী।
ক্ষুদ্র উপহারে তুষ্ট হন মনে জানি॥

তাই প্রাণের আনন্দে উপহার লয়ে।
দিতে এলাম আজি অতি প্রীত হৃদয়ে॥
শত বর্ষ পরমায়ু বামাবোধিনীর হ'ক্।
যুগে যুগে নারীজাতি উচ্চ পদে যাক্॥
বিধাতার ইচ্ছায় সবি সম্ভব হয়।
ভক্তিভরে তাই আজ নমি তাঁর পায়॥

শত্রু।

১

মানবের কত শত্রু আছে এ ধরায়।
অন্তরীক্ষে, জলে, স্থলে,
ব্যাপ্ত আছে ভূমণ্ডলে,
কে করে নির্ণয় তার? সন্ধান কে পায়?
শত শত শত্রু সদা ফিরে পায় পায়॥

২

সিংহ আদি জন্তু থাকে অরণ্যভিতরে।
জলে যত জলচর,
বিবরেতে বিষধর,
শত শত ব্যাধি সদা দুঃখ দেয় নরে।
মানবের শত্রু যত ব্যাপ্ত চরাচরে॥

৩

মানবের কত শত্রু আছে এ ধরায়।
জ্ঞান কিহে তার মাঝে,
হেন শত্রু কেবা আছে,
পরাজিত সব শত্রু, যার শত্রুতায়।
মানবের হেন শত্রু কে আছে ধরায়?

৪

মানবের মত শত্রু নাহি মানবের।
হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থ সহ,
ভ্রমিতেছে অহরহ,
ঘরে ঘরে সর্ব্বনাশ সাধি জগতের।
মানবের মত শত্রু নাহি মানবের॥

৫

হৃদে ভরা কালকূট, মুখভরা হাসি।
বিষকুম্ভ পয়োমুখ,
কুটিলতা পূর্ণ বুক,
মুখেতে জানায় যেন কত ভালবাসি।
সে সকল শুধু স্বার্থ সাধনের ফাঁসি॥

৬

যত হিংস্র জন্তু আছে পৃথিবীতে।
মানবের মত হায়!
নহে কেহ শত্রুতায়,
বাহিরের শত্রু তা'রা কি পারে করিতে?
নরের পরম শত্রু নর অবনীতে॥

৭

তাই বলি ধরাবাসী হও সাবধান।
মুখে যার মধু ভরা,
অন্তরে গরল পোরা,
বাহিরে সুন্দর ভদি অঙ্গার সমান।
তাহার নিকটে সবে হ'য়ো সাবধান॥

৮

বিশ্বাস করিতে পার খল বিষধরে।
হিংস্র জীব জন্তুগণে,
বিশ্বাসী ভাবিও মনে,
বিশ্বাস না ক'রো কভু ক্রূরমতি নরে।
তার সম শত্রু নাই অবনীভিতরে॥

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ।
বারুইপাড়া, খুলনা।

বামাবোধিনীর জন্মোৎসব উপলক্ষে।

কোন্ দেবলোকে দেব! লভিছ বিরাম!
কার্য্যক্ষেত্রে অবিরত,
নিয়ত খেটেছ কত,
তাই কি লভিতে গেছ অনন্ত আরাম?
অবোধ রমণীচিতে
জ্ঞান শিক্ষা প্রদানিতে,
ক'রেছ কতই সদা করি প্রাণপণ।
কর্ম্মবীর, শুদ্ধচিত্ত,
নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত,
আমরা তোমার মত দেখিনি কখন!
আমরা বঙ্গের নারী,
যেন পিঞ্জরের শারী,
সংসার-সাগর-স্রোতে সদা ভেসে যাই।
আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণে,
জ্ঞানের আলোক দানে,
পুণ্যপ্রভা বিতরিতে খেটেছ সদাই।

তুমি দেব ! দয়া ক'রে
যতনে নারীর তরে,
দিয়াছ যে জ্ঞানালোক করিয়া যতন ।
কে আর তোমার মত,
করিয়া যতন এত,
শিখাইবে আমাদের পিতার মতন ?
ভুলিয়া মমতা স্নেহ,
গিয়াছ অমরগেহ,
এ মর্ত্ত জগতে দেখা না পাইব আর ।
আজি ক্ষুদ্র বঙ্গনারী,
তোমার মহিমা স্মরি,
বহিছে নয়নে তার ভক্তি অশ্রুধার ।
নারীরে শিখাতে কর্ম্ম,
বামাবোধিনীর জন্ম—
এ অতুল কীর্ত্তি দেব ! রহিবে অক্ষয় ।
আজি তার জন্মদিনে,
কত কথা পড়ে মনে,
আজি এ উৎসবে তুমি কোথা মহাশয় !
অনাথা করিয়া তায়,
তুমি গেছ অমরায়,
খাটিবে না আর তার শুভ কামনায় ।
বসি ওই দেবপুরে,
আর সুমধুর স্বরে,
গাহিবে না বিভুনাম শুনিব না হায় ।
বিস্তারি কল্পনা-নেত্র,
হেরি ও উৎসব-ক্ষেত্র,
স্মরিয়া মহিমা তব কাতর হৃদয় ।
এ উৎসবভবনে হয়,
তোমা বিনা শূন্যময়,
তোমা বিনা শোভাহীন এ দেব-আলয় ।
হেরেছি যা একদিন,
ভুলিব না তার চিন,
সে স্মৃতি অন্তরমাঝে রহিবে নিয়ত ।
স্বর্গের দেবতা তুমি,
কঠিন এ ভবভূমি,
তাই বুঝি চলে গেলে তাড়াতাড়ি এত ।
হে দয়াল ! দয়া ক'রে,
বামাবোধিনীর তরে,
ঢালহ আশিষ ধারা বসি অমরায় ।
মোরা আজি যোড় করে,
উদ্দেশে ও পদ পরে,
প্রণমি তোমায় দেব, ও রাতুল পায় ।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র ।
হুগলি ।

আবাহন ।

১

রবি, শশী, গ্রহ, তারা
যা আছে তখনো রবে,
কুসুম সুবাস হরি
তখনো সমীর ব'বে ।

২

মোহিবে তখনো প্রাণ
বিহগ মধুর তানে,
তখনো ছুটিবে নদী
আবেগে সাগর পানে ।

৩

এ জীবন শুধু হায়
তখন রবে না আর,
অনুরোধ আকুলতা
সবি হবে বৃথা যায়।

৪

সুখের স্বপন সম
নিশি না পোহাতে হায়,
হাসি খেলা সুখ দুখ
দুদিনে ফুরায়ে যায়।

৫

যে কদিন আছি ভবে
কেন মিছে হিংসা, দ্বেষ?
অনলে অনল বাড়ে
নাহি তাহে শান্তিলেশ।

৬

কেন জাগে পর পর
কে আপন কেবা পর?
সবি যে গো ক্ষণস্থায়ী
ধরা যেন খেলা-ঘর।

৭

ভুলে গিয়ে আত্মপর,
তেয়াগিয়ে কুটিলতা।
সাধিলে কর্ত্তব্য ভবে
না রবে কাহারো ব্যথা।

৮

মানব যে শ্রেষ্ঠ জীব
বিধির দয়ার দান,
হীন মোহে মজি কেন
হারাইব উচ্চ জ্ঞান?

৯

মানবের উচ্চ লক্ষ্য
উচ্চতর আশা রয়,
পশুর জীবন হেন
এ জীবন হীন নয়।

১০

চারি দিকে কত কাজ
রহে পড়ি ধরা প'রে,
লয়ে শুধু মলিনতা
ধিক্! মোরা আছি মরে।

১১

ওই হের কত জনা
সাধিয়া ধরার কাজ,
হতেছে কৃতার্থ ধন্য
নাহি হয় মনে লাজ?

১২

আর দেরি সহে নাক
কাতরে মিনতি করি,
একবার আঁখি মেল
পরমেশ নাম স্মরি।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত,
চট্টগ্রাম।

১৩।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।
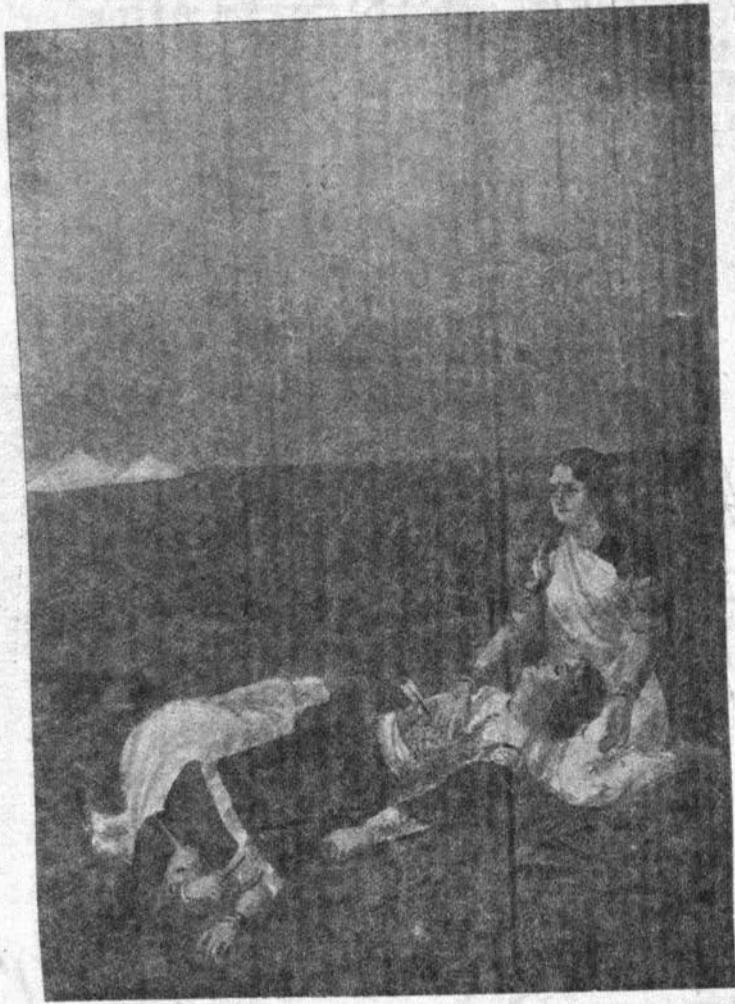
সুভদ্রা-বিলাপ।

আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে সংগৃহীত।

শিশুপ্রেস।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 603. November, 1913.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫১ বর্ষ। ৬০৩ সংখ্যা। } কার্ত্তিক, ১৩২০। নবেম্বর, ১৯১৩ { ১০ম কল্প। ২য় ভাগ

বিবাহে পণ-গ্রহণ।

প্রথম প্রস্তাব—কন্যাপণ।

ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, আর্য্যজাতি ভারতে আসিয়া আদিম নিবাসী অনার্য্যদিগকে বাহুবলে বিতাড়িত ও ভারতবর্ষে আপনাদিগের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। আর্য্যগণ ধার্ম্মিক জ্ঞানী, সংযমী, তেজস্বী, মনস্বী এবং সর্ব্বতোভাবে সভ্য ছিলেন। ইঁহারা পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের অর্দ্ধাংশভাগিনী মহিলাদিগকে যথোচিত সুশিক্ষা দান করিয়া তাঁহাদিগকে অনেক বিষয়ে নিজেদের সহকারিণী করেন। আর্য্যগণ যখন উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেন তখন পরবর্ত্তী বংশধরদিগের সমাজ সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বহুবিধ নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। হিন্দুগণের দশবিধ সংস্কার * সেই নিয়মাবলীর অন্যতম।

হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের মধ্যে বিবাহ সর্ব্ব প্রধান। মানব যে ইতর প্রাণীদিগের তুলনায় শ্রেষ্ঠতম, মানব যে সামাজিক জীব, মানব যে জ্ঞানধর্ম্মে উন্নতিলাভ করিয়াছে, প্রধানতঃ বিবাহ প্রথা হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। অধিকন্তু যে সমাজ যত সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসভ্য, তাহার বিবাহ প্রথার মধ্যে সুব্যবস্থা ও পবিত্রতা ততই অধিক পরিমাণে অনুভূত হইয়া থাকে।

আর্য্যদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র মনুসংহিতায় বহুবিধ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপিত হইয়াছে।

* দশবিধ সংস্কার—বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন।

এই শাস্ত্রে মানবের আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে। যথা—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, আসুর ও পৈশাচ।

ইহার মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ এবং প্রজাপত্য, এই চারি প্রকার বিবাহ প্রধানতঃ ধর্ম্মসঙ্গত বলা হইয়াছে।

মনু বলেন—

সবিশেষ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা কন্যা ও বরের আচ্ছাদন ও পূজন পুরঃসর বিদ্যা ও সদাচার সম্পন্ন নিষ্কাম বরকে যে কন্যাদান, তাদৃশ দান সম্পাদ্য বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলা যায়।

অতি বিস্তৃত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞকালে সেই যজ্ঞের কর্ম্মকর্ত্তা পুরোহিতকে যে সালঙ্কৃতা কন্যাদান, সেই দান সম্পাদ্য বিবাহকে দৈব বিবাহ বলা যায়।

এক গাভী ও এক বৃষকে গোমিথুন বলা যায়। ধর্ম্মার্থ (অর্থাৎ যাগাদি সিদ্ধির জন্য, কন্যা বিক্রয়ের মূল্যরূপে নহে) এক বা দুই গো মিথুন বরপক্ষ হইতে লইয়া ঐ বরকে যে কন্যাদান করা হয় উহাকে আর্ষ বিবাহ বলা যায়।

“তোমরা উভয়ে মিলিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম-আচরণ কর” বর কন্যাকে এই কথা কহিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক যে কন্যাদান, উক্ত দান সম্পাদ্য বিবাহকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলা যায়।

কন্যার অভিভাবকদিগকে এবং কন্যাকে শক্ত্যানুসারে শুল্ক দিয়া বরের স্বেচ্ছানুসারে যে কন্যা গ্রহণ, ঐ কন্যা গ্রহণ সম্পাদ্য বিবাহকে আসুর বিবাহ বলা যায়।

এইরূপ বর কন্যার পরস্পরের অনুরাগ সম্পন্ন বিবাহের নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ, কন্যাকে তাহার পিতৃকুল হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করাকে রাক্ষস বিবাহ এবং নিদ্রিতা বা কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবনে মত্তা কন্যাকে অপহরণপূর্ব্বক যে বিবাহ তাহাকে পৈশাচ বিবাহ বলা যায়।

আর্য্যগণ পৈশাচ বিবাহকে “অধমাধম” বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। আসুর বিবাহে, যখন বরপক্ষ কন্যাকে সুন্দরী বা অন্য কোন কারণে বিবাহযোগ্যা মনে করিয়া কন্যাকে বা কন্যার পিতা প্রভৃতি অভিভাবকদিগকে ধনদান পূর্ব্বক, কন্যাগ্রহণ করিতেন, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদের ঐ স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত “আসুর” আখ্যাত বিবাহকে অপ্রশস্ত কার্য্য রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু যে স্থলে কন্যার পিত্রাদি ইচ্ছাপূর্ব্বক কন্যা বিক্রয় করিয়া ঐ শুল্ক নিজেরা গ্রহণ করে, সেরূপ বিবাহকে শাস্ত্রকারগণ যার পর নাই নিন্দিত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মনু বলেন,—

ন কন্যা যাঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্ণীয়াচ্ছুল্ক-
মন্বপি।
গৃহ্ণন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্য-
বিক্রয়ী॥

(মনু ৩৫১)

বিক্রয় দোষজ্ঞ কন্যার পিতা কখনও কন্যা বিক্রয় করিয়া শুল্ক গ্রহণ করিলে

তিনি অপত্য বিক্রয়ের পাতকী হইবেন।

অন্যত্র আছে—

আদদীত ন শূদ্রোঽপি শুল্কং দুহিতরং
দানং।
শুল্কং হি গৃহ্ণন্ কুরুতে চ্ছন্নং দুহিতৃ
বিক্রয়ম্॥
মনু। ৯ ৯৮।

অতি নীচ শূদ্রজাতিও কন্যার শুল্ক গ্রহণ করিবে না, * যদি উহা গ্রহণ করে তবে কন্যা সম্প্রদাতাকে গোপনভাবে দুহিতৃ বিক্রয়ী বলা যায়।

মনুসংহিতা ভিন্ন অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে ও কন্যাপণের যথেষ্ট নিন্দাবাদ আছে। যথা—

ক্রয়ক্রীতা যা কন্যা পত্নী সা ন
বিধীয়তে।
তস্যাং জাতা সুতাস্তেষাং পিতৃ পিণ্ডং
ন বিদ্যতে।
অত্রি সংহিতা।

অর্থাৎ ক্রয় ক্রীতা কন্যা বিবাহ করিলে সে কন্যা পত্নী নামে অভিহিতা হইতে পারে না। এমন কি তাহার গর্ভে যে সকল পুত্র জন্মে তাহারা পিতার পিণ্ড-দানের অধিকারী নহে।

দত্তক মীমাংসায় উক্ত হইয়াছে—

ক্রয়ক্রীতা তু যা নারী ন সা পত্ন্যভি-
ধীয়তে।
ন সা দৈবে ন সা পৈত্র্যে দাসীং তাং
কবয়োবিদুঃ॥

* অর্থাৎ শাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণাদি উহা কোনমতেই লইবেন না।

ক্রয়ক্রীতা বিবাহিতা নারী পত্নী নামে অভিহিতা হয় না। সে দেবকার্য্যে পিতৃ-কার্য্যে পতির সহধর্ম্মিণী হয় না। পণ্ডি-তেরা তাহাকে দাসী বলিয়া অভিহিতা করেন।

উদ্বাহ তত্ত্বোদ্ধৃত কশ্যপ বচনে কন্যা বিক্রয়ীদিগের বিষয় আরও গুরুতর রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্ব সুতা লোভ
মোহিতাঃ।
আত্মবিক্রয়িণঃ পাপাঃ মহা কিল্বিষ
কারিণঃ॥
পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তি চ সপ্তমং
কুলম্॥

যাহারা লোভমুগ্ধ হইয়া শুল্ক লইয়া কন্যাদান করে, সেই আত্মবিক্রয়ী পাপাত্মা মহাপাপকারীরা ঘোর নরকে পতিত হয় এবং উর্দ্ধতন সাতপুরুষকে নরকে নিক্ষিপ্ত করে।

এই সকল শাস্ত্রীয় বাক্য পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হয় যে, আর্য্যগণ আসুর বিবাহকে অতীব নিন্দনীয়, ঘৃণার্হ বলিয়াই জানিতেন। যদিও ব্যক্তিবিশেষ কুলপ্রথা ক্রমে, কন্যার বিবাহকালে, বরপক্ষের স্বেচ্ছা প্রদত্ত কিঞ্চিৎ শুল্ক গ্রহণ করিত, তাহা বিবাহকালে সেই কন্যাকেই দান করিত। অধর্ম্ম এবং লোকাপবাদ ভয়ে তাহা নিজেরা গ্রহণ করিত না। ভদ্রসমাজে এইরূপ রীতি ছিল। কিন্তু (লোভ-বশতঃ) কন্যা বিক্রয়ীদিগের কার্য্যে শাস্ত্র-কারগণ যে প্রকার ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া-

ছেন, তাহাতে হিন্দুসন্তানগণের পক্ষে কন্যাপণ গ্রহণ করা যে নিতান্ত অকর্ত্তব্য এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র!

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, যে কন্যা বিক্রয়রূপ সমাজের দারুণ অনিষ্টকারী প্রথা, সমাজ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য পরিণামদর্শী আর্য্যঋষিগণ যারপরনাই যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন, সেই দারুণ কুপ্রথা বর্ত্তমাণ কালে সমাজের বক্ষে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া লোকের শোণিত শোষণ করিতেছে। পূর্ব্বকালে ইহা যে কারণেই প্রবর্ত্তিত হউক, এদেশের সামাজিক ইতিবৃত্ত অনুশীলন করিলে অনুভূত হয় যে, বল্লাল সেন প্রবর্ত্তিত কৌলিন্য প্রথাই এই কন্যাপণের মূলীভূত। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বংশজ ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ পাঁচশত হইতে সহস্র মুদ্রা পণে বিবাহার্থ কন্যা ক্রয় করিয়াছেন, এবং কুলীন ও মৌলিক কায়স্থেরা তদধিক পণ দিয়া কুলীন কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে কত সময়ে যে কত অনর্থকরী ঘটনা হইয়াছে, তাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। প্রাচীন ব্যক্তগণ বলিয়াছেন, কত সময়ে অর্থহীন বিবাহার্থী কায়স্থ ব্রাহ্মণাদি ক্ষমতাপন্ন ধনীদিগের সহায়তায় কুলমর্য্যাদা সম্পন্না পাত্রীকে চুরি করিয়া আনিয়া উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। ইহাতে কন্যার পিতৃপক্ষ অর্থলাভে বঞ্চিত ও অপমানিত হইয়া বর পক্ষের সহিত বিবাদ বিসংবাদ করিতেন। সময়ে সময়ে এইরূপ বিবাদ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইত—আসুর বিবাহ রাক্ষস বিবাহে পরিণত হইত। কন্যাপণের জন্য বর্ত্তমান কালেও যে কত স্থানে শঠতা ও প্রবঞ্চনা ঘটিয়া থাকে, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন।

ব্রাহ্মণ কায়স্থ ব্যতীত অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু অর্থাৎ কৈবর্ত্ত, গোপ, কুম্ভকার, নাপিত প্রভৃতি হইতে তৈলকার (কলু). ধীবর, তন্তুবায়, রজক, নমঃশূদ্র প্রভৃতি পর্য্যন্ত অদ্যাপি অনেক পণ দিয়া বিবাহের জন্য পাত্রী ক্রয় করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সমাজে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই দরিদ্র। ইহাদের মধ্যে কত জন অর্থাভাবে বিবাহই করিতে পারে না। পক্ষান্তরে কত জন ঋণ করিয়া বিবাহ করে এবং সেই ঋণ পরিশোধ না হইতেই তাহাদের অনেকের উপরে স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণের ভার পড়ে। তাহারা প্রভূত শারীরিক পরিশ্রমে সামান্য যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, উত্তমর্ণের কুসীদ দান করিতে করিতে তাহার অধিকাংশ ব্যয় হইয়া থাকে। সুতরাং উপযুক্ত ভরণ পোষণের অভাব গ্রস্ত হইয়াই ইহাদিগকে কাল যাপন করিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় যদি ইহাদিগের মধ্যে কাহারও স্ত্রী বিয়োগ হয়, তবে বিপত্নীক ব্যক্তি অতি তরুণ বয়স্ক হইলেও তাহার পুনরায় বিবাহ করা অসম্ভব হইয়া থাকে। আবার কন্যাপণ ফলে অতি অল্প বয়স্কা পাত্রীগণ বিবাহিতা হইয়া থাকে। অধিক; কি ইহাদের

সমাজে দেখা যায় যে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষের সহিত চারি পাঁচ বৎসর বয়স্কা কন্যার বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। এই অবস্থায় পুরুষেরা যদি বিবাহের ছয় বৎসর পরে লোকান্তর প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহাদের সন্তানাদি রাখিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপ স্থলে সেই বিধবার পরিণাম যে কতদুর শোচনীয় হয়, তাহা সকলে মনে মনে অনুভব করুন। এতদ্ভিন্ন উপরোক্ত কারণে এই সকল শ্রেণীর যেরূপে বংশ লোপ হইয়া যাইতেছে যদি সামাজিক নিয়মে তাহার কোনরূপ প্রতীকার না হয়, তবে অচিরকাল মধ্যেই যে ইহাদের বংশ লোপ হইয়া যাইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা পল্লিগ্রামবাসী, অথবা যাঁহারা পল্লিগ্রামের অবস্থা বিশেষ রূপে অবগত আছেন. নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগের বংশ যে কিরূপ দ্রুত গতিতে ক্ষয় হইতেছে. সে কথা তাঁহারা অবশ্যই জানিতেছেন। ম্যালেরিয়া, অর্দ্ধাশন, নিয়মাতিরিক্ত শ্রম এবং এই কন্যাপণ যে এইরূপ বংশলোপের কারণ, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অন্যান্য কারণ নিরাকরণ করার দায়িত্ব স্বয়ং রাজার উপরে প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া থাকে, কিন্তু এই কন্যাপণ নিরাকরণ করিবার জন্য সমাজ নিজেই দায়ী। সকলেই বুঝিতে পারেন এই কন্যাপণ হইতে এ দরিদ্র দেশে অধিকতর দরিদ্রতা, নৈতিক হীনতা এবং লোকক্ষয় সঙ্ঘটিত হইয়া প্রভৃত অমঙ্গল সাধন করিতেছে।

কন্যাপণ প্রথা নিবারণ কল্পে, ভারতের কত সুসন্তান বহুল চেষ্টা করিতেছেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর পুর্ব্বে মহাত্মা প্যারিচরণ সরকার, পাণ্ডিতবর দ্বারকা নাথ বিদ্যাভুষণ প্রমুখ সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তিগণ কন্যাপণগ্রহণের বিরুদ্ধে বিশেষ আন্দোলন করিয়াছিলেন। তাঁহারা এডুকেশন গেজেট এবং সোমপ্রকাশে ইহার শাস্ত্রনিষিদ্ধতা এবং সামাজিক অনিষ্ট কারিতা সম্বন্ধে সুযুক্তি পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এইরূপ যত্ন ও চেষ্টার ফলে কন্যাপণ যে সাধুজন বিগর্হিত নীচ প্রথা, তাহা অনেকেরই বোধগম্য হইল ও কালে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি ভদ্র বংশীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে কন্যাপণ গ্রহণ প্রথা অনেকটা হ্রাস প্রাপ্ত হইল।

বর্ত্তমান কালে কলিকাতা হইতে কন্যাপণ প্রায়ই বিতাড়িত হইয়াছে। পল্লিগ্রাম হইতে ইহা একেবারে দুরীভুত না হইলেও ইহার প্রভাব অনেকটা নিস্তেজ হইয়াছে। তবে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে এই কুপ্রথা যে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, সে কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি।

(ক্রমশঃ)